Contents

তাওহীদের ডাক

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৪

- ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৩
- সোনামণি সংগঠনের বাস্তবায়ন পদ্ধতি
- সফল কর্মীর আচরণবিধি
- জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত সমূহ
- মুস'আব বিন ওমায়ের

পবিত্র কা'বা যখন রণক্ষেত্র

মুজাফফর নগর

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লীলাভূমি

RIOT

Contents
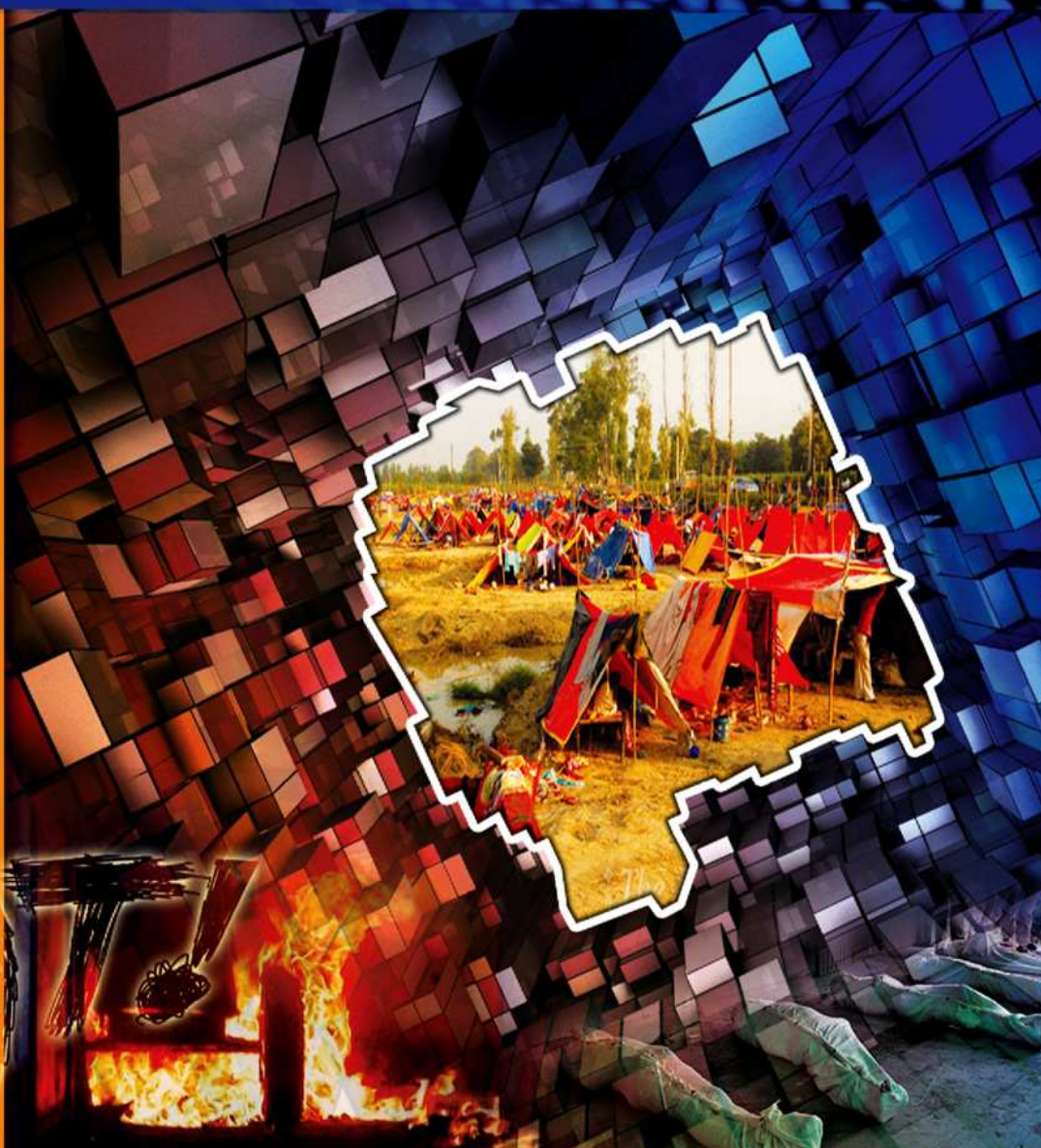
তাওহীদের ডাক

১৬তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৪

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

হক্ব সংগঠন : ছিরাতে মুস্তাক্বীম ও নির্ভেজাল তাওহীদী দাওয়াতের অতন্দ্রপ্রহরী

'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই প্রত্যেক ছালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সারা জীবন আল্লাহ্‌র কাছে এ জন্য প্রার্থনা করতে হয়। ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা এ জন্যই ফরয। ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সন্ধান পেয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ ঐ ব্যক্তি এক সময় গন্তব্যে পৌঁছাবেই। আস্তে হোক বা ধীরে হোক, একাকী হোক বা কারো সহযোগিতায় হোক- যদি মাঝপথে দিক বিভ্রান্ত না হয় এবং ছিটকে না পড়ে। আর এই পথিক যেন কোন সময় পথ না হারায় সে জন্য হক্ব সংগঠন অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে উক্ত সংগঠনকে যাচাই করে নির্ধারণ করতে হবে। আর তা হল রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জামা'আত *(তিরমিযী হা/২৬৪১)*।

অনুরূপভাবে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতটা কী, একজন দাঈ কোন্ দাওয়াত মানুষের সামনে পেশ করবেন, জনসাধারণ কোন্ দাওয়াত গ্রহণ করবে এবং কাদের সাথে অবস্থান করবে তার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল হক্ব সংগঠন। কারণ অগণিত নোংরা মতবাদ, অসংখ্য ভ্রান্ত পথ, শত শত বাতিল ফের্কা, হাযার হাযার জাহান্নামী আলেম এবং লক্ষ লক্ষ মিথ্যা ও ভুয়া আমল সমাজে প্রচলিত আছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের খপ্পরে কেউ পড়ে গেলে তার আর বাঁচার পথ নেই। তারা তাকে জাহান্নামে ফেলে দিবে *(বুখারী হা/৭০৮৪; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৭)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জামা'আত হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল গযব' *(আহমাদ হা/১৮৪৭২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৬৭, সনদ হাসান)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে, যে জামা'আত হতে বিচ্ছিন্ন থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'তিনজন লোকের জন্যও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা হয়' *(আবুদাঊদ হা/২৬০৮, সনদ হাসান)*। ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে সম্মান কর। কারণ তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর তাদের পরবর্তীদেরকে, অতঃপর তাদের পরবর্তীদেরকে সম্মান কর। এরপর মিথ্যার আবির্ভাব ঘটবে। এমনকি কোন ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) কসম করবে, অথচ তার নিকট কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দিবে, অথচ সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যভাগে থাকার আশা পোষণ করে, সে যেন জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা ওয়াজিব করে নেয়। কেননা শয়তান ঐ ব্যক্তির সাথে থাকে, যে জামা'আত হতে পৃথক থাকে *(নাসাঈ হা/৩৮০৯)*। অন্য হাদীছে এসেছে যে, ফেৎনার যুগে যাবতীয় ভ্রান্ত দল পরিত্যাগ করে হক্ব জামা'আতকে আঁকড়ে ধরতে হবে *(বুখারী হা/৩৬০৬)*। এ ধরনের নির্দেশনা কুরআন-হাদীছে আরো অনেক রয়েছে।

উক্ত দলীলগুলো প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির শিরোধার্য কর্তব্য হল, ছিরাতে মুস্তাক্বীম বা ছাহাবায়ে কেরামের রাস্তা খুঁজে বের করা এবং হক্ব জামা'আত নির্ধারণ করা। সেই সাথে অন্যান্য ভ্রান্ত ফের্কা ও বিদ'আতী দলগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা। কারণ আল্লাহ বলেন, 'যে সকল ব্যক্তি তাদের দ্বীনকে টুকরা টুকরা করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, হে রাসূল! তাদের কার্যপলাপের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই' *(আন'আম ১৫৯)*। এক্ষণে প্রশ্ন হল, উক্ত জামা'আত কি সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া শর্ত? প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলাম কখনোই কোন অবস্থাতেই সংখ্যার দাম দেয়নি। বরং হক্বকে প্রাধান্য দিয়েছে *(মুসলিম হা/৩৮৯)*। তাই ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জামা'আতের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় জামা'আত তাকেই বলে, যার সাথে হক্বের মিল রয়েছে, যদিও তার সদস্য তুমি একজন হও' *(তারীখে ইবনে আসাকির ১৩/২২৩; সনদ ছহীহ)*। এক্ষণে দেখার বিষয়, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করার প্রতি কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে? বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে কেন বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে? এই অনুভূতিটুকু কি আমাদের মধ্যে আছে? এর মৌলিক কারণ হল, হক্ব জামা'আতের উপর আল্লাহ্‌র রহমত থাকে। ফলে ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া এর নেতৃত্ব দেন আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত উলুল আমর বা শরী'আত অভিজ্ঞ দূরদর্শী যোগ্য ব্যক্তি, যিনি সালফে ছালেহীনের মূলনীতির আলোকে উপযুক্ত সময়ে কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেশ করতে পারেন। এ জন্যই আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের সাথে উলুল আমরের আনুগত্যকেও শর্তযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের উলুল আমরের। যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয়, তবে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিসমাপ্তি' *(নিসা ৫৯)*।

প্রশ্ন হল, উক্ত 'উলুল আমর' কে? তিনি কি ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র গজিয়ে উঠেন? প্রত্যেক গ্রামে, মহল্লায় নাযিল হন? সকলেই কি উক্ত গুণে ভূষিত হতে পারেন? তিনি কি জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিক পাতি নেতা? তিনি কি আনুগত্যশূন্য স্বঘোষিত মূর্খ আমীর? তিনি কি পেটপূজারী বিদ'আতী আলেম? যে খানকা-মাযারে বসে কোটি কোটি মানুষকে মুশরিক বানাচ্ছে সেই ভণ্ড পীর কি উলুল আমর? তিনি কি ইবলীস শয়তানের স্পেশাল এজেন্ট ত্বাগূতের ধ্বজাধারী রাষ্ট্রীয় নেতা? কখনোই না। প্রশ্নই আসে না। এ সমস্ত স্বেচ্ছাচারী, অহংকারী, অজ্ঞ, প্রতারক, ধান্দাবাজ, দালাল, পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কখনো উলুল আমর হতে পারে না। নেতৃত্বপূজারী ঐ নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নিজেরা দাবী করতে পারে, কিন্তু তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নয়। কুরআনে অবশ্যই তাদের কথা বলা হয়নি। মূলতঃ তিনি হলেন আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত খলীফা।

খলীফার অনুপস্থিতিতে তিনি হবেন প্রত্যেক যুগের নেতৃত্বের গুণাবলীসম্পন্ন শরী'আত অভিজ্ঞ তাক্বওয়াশীল ও দূরদর্শী নেতা বা আমীর, মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ, যাকে আল্লাহ দ্বীনের অফুরন্ত জ্ঞান দান করেন *(বাক্বারাহ ২৬৯; বুখারী হা/৭১)*। আর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত উলুল আমর দ্বারা পরিচালিত জামা'আত কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। দুনিয়া থেকেও তারা নিশ্চিহ্ন হবে না; বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/৫০৫৯)*। এই জামা'আতের নেতৃত্বের পরিবর্তন হবে কিন্তু নীতির পরিবর্তন হবে না। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হামদ।

জামা'আত থেকে পৃথক থাকলে পথভ্রষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। কারণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য সকল মানুষের পক্ষে বুঝা এবং সেখান থেকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত বের করা সম্ভব নয়। এই বিশেষ জ্ঞান যে আল্লাহ সকলকে দেন না, তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারাই প্রমাণিত। আর এই সূত্রের অনুসরণ না করে নিজের মত করে কুরআন-হাদীছ বুঝতে গিয়ে অসংখ্য মানুষ সালফে ছালেহীন তথা ছাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে ছিটকে পড়ছে। ইসলামের নামে ভ্রান্ত থিওরি আমদানী করছে; নতুন নতুন রাস্তা ও ফের্কার জন্ম দিচ্ছে; উদ্ভট ফৎওয়া দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তাই হক্ব সংগঠনের সাথে জড়িত থাকলে এই আশংকা থাকবে না। যেমন আল্লাহ্র নির্দেশ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক *(তওবা ১১৯)*।

অনুরূপ ঐক্যবদ্ধভাবেই একজন নেতার অধীনে নির্ভেজাল তাওহীদের কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাও আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, 'বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*। উক্ত আয়াতে একাকী ডাকার কথা বলা হয়নি; বরং একজন নেতার অধীনে কর্মীদেরকে দলীলসহ দাওয়াত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান জানাবে, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ১০৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ১১০)*। উক্ত নির্দেশগুলোর কারণেই রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন ব্যক্তির নেতৃত্বে *(বুখারী হা/৭৩৭২)*।

দুঃখজনক হল, একশ্রেণীর ব্যক্তি নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনায় চরম নাখোশ। বরং বিরোধিতা করাই তাদের দাওয়াতের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা সঊদী, কুয়েত ইত্যাদি দেশের দোহাই দিয়ে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। যদিও তাদের দাওয়াতী কার্যক্রমের পরিধি একেবারেই সীমিত। কিন্তু দাওয়াতী কার্যক্রম যে হেকমতপূর্ণ এবং তার ধরণ যে পরিবর্তনশীল তা তারা মানতে রাযী নন। অথচ নবী-রাসূলদের যুগেও দাওয়াতী কার্যক্রমের ধরণ পরিবর্তনশীল ছিল। মূসা (আঃ)-এর যুগে ছিল যাদুর প্রভাব। লাঠির মাধ্যমে আল্লাহ তা খর্ব করেছেন। ঈসা (আঃ)-এর যুগে ছিল ঝাড়ফুঁকের প্রভাব। তাঁকে মু'জিযা দ্বারা তা দমন করেছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়ে ছিল সাহিত্যের প্রভাব। তাই পবিত্র কুরআনের মত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য দ্বারা তাদের অহংকার ভেঙ্গে দিয়েছেন। সুতরাং যে দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত সে দেশের সাথে বাংলাদেশের অবস্থা তুলনীয় নয়। দাওয়াতী মূলনীতি এক ও অভিন্ন হবে কিন্তু কৌশল ভিন্ন হতেই হবে।

অন্যদিকে হক্বপন্থী সংগঠনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এবং নির্ভেজাল তাওহীদের একনিষ্ঠ দাঈ হওয়ার পরও অনেকের মাঝে একটু শূন্যতা অনুভব করা যায়। তা হল- দ্বিধাভক্ত উম্মত কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে? ওলামায়ে কেরাম কিভাবে এক প্লাটফরমে সমবেত হবে? অবস্থা যদি এমন হয় তবে কিভাবে সর্বত্র ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটবে? এরূপ হতাশা আছে অনেকের মাঝে। অথচ উক্ত ভাবনাটাই ভুল। কারণ দাঈর কাজ শুধু শরী'আতের বাস্তব অবস্থাটা মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং এ জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো। সফলতা দানের মালিক আল্লাহ। দাঈর দায়িত্ব হেদায়াতের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। হেদায়াত করার মালিক আল্লাহ *(ক্বাছাছ ৫৬)*। দাঈ তার প্রতিদান পুরোপুরি পেয়ে যাবেন। আর ওলামায়ে কেরামের বিভক্তি, দ্বীনের ইখতেলাফ, উম্মতের দলাদলি প্রকৃত দাঈর কাছে কোন চিন্তার বিষয় নয়। কারণ এগুলো বন্ধ করা যাবে না। কারণ বিভক্তির পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাই ঘৃণা করতে হবে। দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলাফল আল্লাহ যখন দুনিয়াতে দেখাতে চাইবেন, তখন এগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না ইনশাআল্লাহ। যেমন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর যুগ। এত বিভক্তি, মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গার মাঝে তিনি কিভাবে দ্বিতীয় ওমর ও পঞ্চম খলীফার মর্যাদায় ভূষিত হলেন? উপমহাদেশে শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর যুগ। অসংখ্য আলেমের বিরোধিতা ও হাযার হাযার ফের্কার ভেদাভেদ সত্ত্বেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন কিভাবে সফল হয়েছিল? ঐ বিভক্ত ফের্কাগুলো কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? এগুলো সব আল্লাহ্র খাছ মদদে হয়েছিল। যেমন একটি বাঁশ গাছ কোথাও ঝাড় নিয়ে গজিয়ে উঠলে তার তলায় কোন আগাছার অস্তিত্ব থাকে না বা মাথা চাড়া দিতে পারে না। এ ধরনের প্রমাণ সমাজে ভুরি ভুরি রয়েছে।

অতএব আসুন! আমরা নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য হক্ব সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হই এবং আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ আমাদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

ইখলাস

আল-কুরআনুল কারীম :

১- قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.

‘বলুন! আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কী আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমরা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ’ *(বাক্বারাহ ২/১৩৯)*।

২- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ.

‘বলুন! আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের। প্রত্যেক ছালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে’ *(আ'রাফ ৭/২৯)*।

৩- هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা তাঁকে ডাক-তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে; সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই’ *(মুমিন ৪০/৬৫)*।

৪- فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.

‘তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়’ *(‘আনকাবূত ২৯/৬৫-৬৬)*।

৫- وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

‘সেই রমণী (যুলায়খা) তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। আমি তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

৬- قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

‘বলুন, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে। আর আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই’ *(যুমার ৩৯/১১-১২)*।

৭- وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

‘তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং ছালাত ক্বায়েম করতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দ্বীন’ *(বাইয়েনাহ ৯৮/৪-৫)*।

৮- إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً

‘মুনাফিকগণ তো জাহান্নামের নিম্ন স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সহায় পাবে না। কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনগণকে আল্লাহ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন’ *(নিসা ৪/১৪৫-১৪৬)*।

৯- وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ، لَكُنَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

‘এরাই তো বলে আসছে। পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত; আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হতাম। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে’ *(ছাফফাত ৩৭/১৬৭-১৭০)*।

১০- وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ.

‘স্মরণ করুন, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম, যা ছিল পরলোকের স্মরণ’ *(ছোয়াদ ৩৮/৪৫-৪৬)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির ছালাত আদায় করবে তখন তার জন্য একনিষ্ঠচিত্তে দো‘আ করবে *(আবুদাউদ হা/৩১৯৯; ইবনু মাজাহ হা/১৪৯৭; মিশকাত হা/১৬৭৪, সনদ হাসান)*।

১২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আতের সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠচিত্তে ও হৃদয় দিয়ে ‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বলবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৪)*।

১৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠচিত্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। এমনকি আরশ পর্যন্ত এর নেকী পৌঁছানো হবে; যদি সে কাবীরা গোনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে *(তিরমিযী হা/৩৫৯০; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৪৮, সনদ হাসান)*।

১৪- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি অংশীবাদীদের অংশীবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে আমি তাকে তার সেই শিরকসহ বর্জন করি। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার সাথে আমর কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ ঐ কাজ বা আমলটি তার জন্যই গণ্য হবে, যার জন্য সে করেছে *(মুসলিম হা/৭৬৬৬; মিশকাত হা/'৫৩১৫)*।

১৫- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না; বরং তিনি মানুষের অন্তর ও আমলের দিকে দৃষ্টি দিবেন *(মুসলিম হা/৬৭০৮; মিশকাত হা/৫৩১৪)*।

১৬- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি যার জন্য নিয়ত করবে সে তাই পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজররত করবে তার হিজরতে তার দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যার দিকে সে হিজরত করেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*।

১৭- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং তাঁহারই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে ছাওয়াব ও গণীমত লাভ করেছে তা সমেত তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান হতে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল *(বুখারী হা/৩১২৩; মুসলিম হা/৪৯৬৯)*।

১৮-عَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنْ يُوَافِىَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

উতবান বিন মালেক আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সকালে আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় যে ব্যক্তি 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং এ বিশ্বাস সহকারে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন *(বুখারী হা/৬৪২৩)*।

১৯- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃতার্থে শাহাদত কামনা করে তবে তাকে সে মর্যাদা প্রদান করা হবে যদিও সে তা লাভ করতে না পারে *(মুসলিম হা/৫০৩৮)*।

২০- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِى جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি যখন আমার মুমিন বান্দার কোন প্রিয়বস্তু দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেয় আর সে ধৈর্য ধারণ করে, আমার কাছে তার জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই প্রতিদান নেই *(বুখারী হা/৬৪২৪; মিশকাত হা/১৭৩১)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. মাকহূল বলেন, কোন বান্দা কখনো যদি চল্লিশ দিন ইখলাছ অবলম্বন করে, তাহলে তার অন্তর ও রসনা থেকে জ্ঞানের মুক্তা ঝরবে *(মাদারিজুস সালেকীন, ২/৯৬ পৃঃ)*।

২. ইউসুফ বিন হুসাইন বলেন, পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে ইখলাছই অধিক মর্যাদাবান।

৩. ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা আল্লাহ ও বান্দার মাঝের গোপনীয় বিষয়। ফেরেশতাও জানতে পারে না যে, তিনি তা লিখবেন। শয়তানও জানতে পারে না যে, তাকে নষ্ট করবে। আর প্রবৃত্তিও বুঝতে পারে না যে, তাকে দুর্বল করবে *(মাদারিজুস সালেকীন, ২/৯৫ পৃঃ)*।

৪. ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ইখলাছ বিহীন আমল ও ইকতেদা ঐ মুসাফিরের মত, যে থলিতে বালি ভর্তি করে বহন করে কিন্তু তার থেকে উপকৃত হয় না *(আল-ফাওয়াইদ, পৃঃ ৬৭)*।

সারবস্তু :

১. ইখলাছ হল কথা ও আমলসমূহ গ্রহণীয় হওয়ার মৌলিক ভিত্তি।
২. ইখলাছ দো'আ কবুলের মূল শিকড়।
৩. ইখলাছ দুনিয়া ও আখেরাতে মানুষের মর্যাদাকে সমুন্নত করে।
৪. ইখলাছ মানুষকে ভুল ও কুমন্ত্রণা থেকে দূরে রাখে।
৫. ইখলাছের কারণে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং উম্মতকে এর দ্বারা আল্লাহ সাহায্য করেন।

Contents

ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৩

-মুযাফফর বিন মুহসিন

(৬) মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী :

সমাজে উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা বহুল প্রচলিত। এর পক্ষে কতিপয় জাল দলীল পেশ করা হয়। সেই জাল বর্ণনাগুলোই মূল পুঁজি।

(১) أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ

(ক) (রাসূল (ছাঃ) বলেছেন) 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন'।

(ب) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ أَخْبِرْنِىْ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ؟ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلاَ قَلَمٌ وَلاَ جَنَّةٌ وَلاَ نَارٌ وَلاَ مَلَكٌ وَلاَ سَمَاءٌ وَلاَ أَرْضٌ وَلاَ شَمْسٌ وَلاَ قَمَرٌ وَلاَ جِنِّىٌ وَلاَ إِنْسِىٌّ فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَلِكَ النُّوْرَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِىْ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ حَمْلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِىْ الْكُرْسِىَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِى الْمَلاَئِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَمَاوَاتِ وَمِنَ الثَّانِىْ الْأَرْضِيْنَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ...

(খ) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আমাকে বলুন, সৃষ্টি সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কোন্ জিনিসকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, হে জাবের! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর পূর্বে তাঁর নূর থেকে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এই নূর আল্লাহ্র কুদরতে স্বাধীনভাবে ঘুরতে লাগল। আর তখন লাওহে মাহফূয, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আসমান, যমীন, সূর্য, চন্দ্র, জিন, মানুষ কিছুই ছিল না। অতঃপর যখন জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি ঐ নূরকে চার ভাগে ভাগ করলেন। ১ম ভাগ দ্বারা কলম, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা লাওহে মাহফূয, তৃতীয় ভাগ দ্বারা আরশ তৈরি করলেন। তারপর চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগে ভাগ করলেন। ১ম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা কুরসী, তৃতীয় ভাগ দ্বারা অন্যান্য ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন। তারপর উক্ত চতুর্থ ভাগকে আবার চার ভাগে ভাগ করলেন। ১ম ভাগ দ্বারা আসমান সমূহ, দ্বিতীয় ভাগ দ্বারা যমীন সমূহ, তৃতীয় ভাগ দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন..।[১]

(গ) এছাড়া একটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- আল্লাহ বলেন, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُبِيْنٌ 'নিশ্চয় তোমাদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং তা স্পষ্ট কিতাব' *(মায়েদাহ ১৫)*।

১. ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-জারাহী আল-আজলূনী, কাশফুল খাফা মুযীলুল ইলবাস আম্মা ইশতাহারা আলা আলসিনাতিন নাস হা/৮২৭, ১/২৫৬ পৃঃ।

পর্যালোচনা :

(ক) প্রথমে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার পক্ষে কোন জাল বর্ণনাও নেই। শুধু মানুষের মুখে মুখেই প্রচলিত। তাই প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বর্ণনাটিকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, لَمْ يَثْبُتْ بِهَذَا الْمَبْنَى 'উক্ত শব্দে কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নি'।[২] তাই উক্ত মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা আলোচনারই দাবী রাখে না। যারা রাসূল (ছাঃ)-এর নাম দিয়ে এগুলো প্রচার করে থাকে তাদের কী হবে? কবি গোলাম মুছত্বফা তার 'বিশ্ব নবী' বইয়ে উক্ত অংশটুকু বাংলা উচ্চারণ করে লিখেছেন।

(খ) উক্ত বর্ণনাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। পাঠক মাত্রই বুঝতে পারছেন যে, এটি একটি গালগল্প ছাড়া কিছু নয়। নবীর নূর দ্বারা যদি জাহান্নাম তৈরি হয়, তবে সে জাহান্নাম মানুষকে পোড়াতে পারবে কি? যদি মানুষকে পুড়িয়ে ফেলে তবে নবীর নূরের মর্যাদা কি থাকল? দুঃখজনক হল এই জাজ্বল্য কাহিনীটি কোন জাল হাদীছের গ্রন্থেও বর্ণিত হয়নি। মুহাদ্দিছ আলী হাশীশ বলেন, هَذِهِ الْقِصَّةُ الْوَاهِيَةُ قِصَّةُ خَلْقِ الْعَالَمِ مِنْ نُوْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 'রাসূল (ছাঃ)-এর নূর দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে বর্ণিত কাহিনী একবারে বাজে কাহিনী'।[৩] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বাতিল হাদীছ বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৪] আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, كُلُّ ذَلِكَ كَذِبٌ مُفْتَرَى بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ 'মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে এগুলো সবই মিথ্যা অপবাদ'।[৫]

সুধী পাঠক! উক্ত মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনার কারণেই সমাজে ভ্রান্ত আক্বীদা চালু আছে। আরো দুঃখজনক হল, কথিত বড় বড় মুহাদ্দিছ ও ওলামা মাশায়েখের মুখ থেকে বিশাল বিশাল সমাবেশে উক্ত বর্ণনাগুলো শুনা যায়। তারা কি রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যাচার করে পার পেয়ে যাবে? অসম্ভব। মূলতঃ এই মিথ্যা কাহিনীগুলো তৈরি করেছে তথাকথিত ছূফী তরীকাধারী শিরকের এজেন্টরা।[৬]

২. আল-আছারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৪৩।
৩. সিলসিলাতুল আহাদীছিল ওয়াহেয়াহ, পৃঃ ১৫৭।
৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা দ্রঃ- خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم عليه السلام مما قد وصف لكم . رواه مسلم وغيره . وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس : أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ! ونحوه من الأحاديث التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور ।
৫. আল-আছারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৪৩।
৬. সিলসিলাতুল আহাদীছিল ওয়াহেয়াহ, পৃঃ ২৭৪- قد نقلناه بتمامه لنبين مدى الكذب والكفر والهذيان وهذا الحديث هو عمدة الصوفية فيما زعموه واعتقدوه ونشروه أن الرسول هو قبة الكون، وهو أول الوجود، وأنه جزء من نور الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأن كل المخلوقات خلقت بأجزاء منه، بل قال ابن العربي أن الرسول هو الذي استوى على عرش الله حيث يقول بالنص "بدء الخلق الهباء وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء على العرش الرحماني وهو العرش الإلهي "–الفتوحات المكية ج١ ص١٥٢،

(গ) উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'নূর' দ্বারা হেদায়াতের নূর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিতাব। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ 'মুমিনরা ঐ নূরের অনুসরণ করে, যা মুহাম্মাদের সাথে নাযিল হয়েছে' *(আ'রাফ ১৫৭)*। এছাড়া অন্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে আল্লাহ বলেন, فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِيْ أَنْزَلْنَا 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঐ নূরের প্রতি ঈমান পোষণ কর, যা আমরা নাযিল করেছি' *(তাগাবুন ৮)*। অতএব উক্ত নূর দ্বারা কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির তৈরী :

অন্যান্য আদম সন্তানের ন্যায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)ও একজন মাটির তৈরি মানুষ। এটাই সঠিক আক্বীদা এবং সালফে ছালেহীন ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা।

(ক) আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.

'বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন। সুতরাং যে তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

উক্ত আয়াত ছাড়াও আরো আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) একজন মানুষ *(বানী ইসরাঈল ৯৩; হা-মীম সিজদা ৬)*। তাহলে মানুষ কিসের তৈরি? আমরা আল্লাহর ভাষায় দেখি- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ 'আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে হচ্ছে- তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা মানুষ হিসাবে ছড়িয়ে গেছ' *(রূম ২০)*। হাদীছেও বহু স্থানে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) মাটির তৈরি। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সকল ফেরেশতাকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সমস্ত ছিফাত দ্বারা, যে ছিফাতে তোমাদের ভূষিত করা হয়েছে'। অর্থাৎ মানব জাতিকে মাটি ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।[৭] অন্য বর্ণনায় সরাসরি বলা হয়েছে, وَالنَّاسُ بَنُوْ آدَمَ وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ 'মানুষ আদমের সন্তান। আর আল্লাহ আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'।[৮]

অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির তৈরি এই আক্বীদাই পোষণ করতে হবে। তিনি নূরের তৈরি এই আক্বীদা বর্জন করতে হবে। বিভিন্ন ব্যক্তি উক্ত মর্মে কবিতাও লিখেছেন। নূর মুহাম্মাদ, নূরুন্নবী ইত্যাদি নাম সমাজে দেখা যায়। এগুলোও পরিবর্তন করতে হবে।

৭. মুসলিম হা/৭৬৮৭, ২/৪১৩ পৃঃ, 'যুহদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত হা/৫৭০১।
৮. তিরমিযী হা/৩২৭০, 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

(৭) আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবী, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করতেন না :

উক্ত আক্বীদা সঠিক নয়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এটি কারো সাথে শর্তযুক্ত নয়। উক্ত ভ্রান্ত দাবীর পক্ষে কতিপয় জাল বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন-

(أ) لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاَكَ

(ক) (আল্লাহ বলেন) আপনাকে সৃষ্টি না করলে বিশাল জগৎ সৃষ্টি করতাম না।[৯]

(ب) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ قَالَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ.

(খ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একদা জিবরীল (আঃ) আমার কাছে আসলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ বলেছেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আপনাকে সৃষ্টি না করলে জান্নাত সৃষ্টি করতাম না এবং আপনাকে সৃষ্টি না করলে জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না।[১০]

(ج) لَوْلاَكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا

(গ) আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না।[১১]

(د) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرْتَ لِيْ فَقَالَ اللهُ يَا آدَمُ وَ كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ وَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تَضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَى أَحَبِّ الْخَلْقِ فَقَالَ اللهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ اُدْعُنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ.

(ঘ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন আদম (আঃ) অপরাধ করে ফেললেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসীলায় ক্ষমা চাচ্ছি, যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পারলে, অথচ আমি তাকে এখনো সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) তখন বললেন, হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাকে আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং আমার মাঝে আপনার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেন তখন আমি মাথা তুলে দেখি যে, আরশের পায়ের সাথে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা আছে। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তির নামই আপনার নামের সাথে যুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ হে আদম! নিশ্চয় মুহাম্মাদই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তুমি তার অসীলায় আমার কাছে দু'আ কর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।[১২]

৯. ছাগানী, মাওযূ'আত, পৃঃ ৭।
১০. দায়লামী, আল-ফেরদাঊদ ১/৪১ পৃঃ; আল-আছারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৪৪।
১১. ইবনু আসাকির; দায়লামী, আল- ফেরদাউস হা/৮০৩১।
১২. মুস্তাদরাক হাকেম হা/৪২২৮।

(د) كُنْتُ نَبِيًّا وَلاَ آدَمَ وَلاَ مَاءَ وَلاَ طِيْنَ.

(ঙ) যখন আদম, পানি ও মাটি কিছুই ছিল না তখন আমি নবী ছিলাম।

(ه) كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِى الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ فَبَدَأَ بِىْ قَبْلَهُمْ.

(চ) সৃষ্টির মধ্যে আমিই প্রথম নবী ছিলাম। প্রেরণের সময় আমি তাঁদের সবশেষে এসেছি। তাঁদের পূর্বে আমার দ্বারাই সৃষ্টির সূচনা করেছেন।[১৩]

পর্যালোচনা :

বর্ণনাগুলো জাল হাদীছের গ্রন্থে মুহাদ্দিছগণ একত্রিত করেছেন। কিন্তু সমাজের তথাকথিক আলেমরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। (ক) প্রথম বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হলেও বর্ণনাটি জাল ও ভিত্তিহীন। কোন হাদীছগ্রন্থে এর কোন অস্তিত্ব নেই।[১৪] (খ) বাতিল বর্ণনা। একেবারেই উদ্ভট।[১৫] (গ) এটিও মিথ্যা বা জাল বর্ণনা।[১৬] (ঘ) মিথ্যা বর্ণনা। এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম নামে দুইজন মিথ্যুক রাবী আছে। যদিও ইমাম হাকেম বলেছেন, ছহীহ সনদ। কিন্তু তিনি শৈথিল্যবাদীদের একজন। তার সব মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৭] দ্বিতীয়তঃ যার অস্তিত্বই নেই তার অসীলায় কিভাবে দু'আ করা যায়? এটি শিরকী আক্বীদা। (ঙ) এ বর্ণনাটিও জাল।[১৮] তবে ছহীহ বর্ণনা হল, আমি তখন থেকেই নবী যখন আদম (আঃ) রূহ এবং শরীরের মাঝে ছিলেন।[১৯] এর উদ্দেশ্য হল- তাক্বদীর, যা পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে নির্ধারিত হয়েছে।[২০] (চ) সর্বশেষ বর্ণনাটিও মিথ্যা ও বাতিল।[২১]

অতএব উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা বর্জন করতে হবে। সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৮) মুহাম্মাদ (ছাঃ) মারা যাননি; বরং স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র। তিনি কবরে জীবিত আছেন। অর্থাৎ হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাস করা। এমনকি ওলী-আওলিয়াও কবরে জীবিত আছেন।

খানকা ব্যবসায়ীরা উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা সমাজে চালু রেখেছে। তারা নিম্নোক্ত দলীলগুলোর অপব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন-

(أ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ.

(ক) আসান ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নবীগণ তাদের কবরে জীবিত থেকে ছালাত আদায় করছেন।[২২]

(ب) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِىْ قَبْرِهِ.

(খ) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি যখন লাল টিলার নিকট দিয়ে মূসা (আঃ) কে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন।[২৩] অনুরূপ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে।[২৪]

(ج) إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ.

(গ) 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ যমীনের উপর নবীগণের শরীরকে হারাম করে দিয়েছেন।[২৫] অন্যত্র এসেছে, مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِىْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ 'কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করলে আমার রূহ ফেরত দেয়া হয় এবং আমি তার প্রতি সালামের উত্তর দেই'।[২৬]

পর্যালোচনা :

বর্ণিত হাদীছগুলো ছহীহ। কিন্তু তা বারযাখী জীবনের বিষয় অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের মাঝের জীবন। দুনিয়াবী জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ এগুলো গায়েবের বিষয়। যেমন- রাসূল (ছাঃ) মূসা (আঃ)-কে কবরে ছালাত আদায় করতে দেখলেন কিন্তু একটু পরে ৬ষ্ঠ আসমানে দেখা হল।[২৭] এরপর যখন ফিরে আসলেন তখন সকল নবী-রাসূলগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর ইমামতিতে ছালাত আদায় করলেন বায়তুল মাক্বদেছে।[২৮] সুতরাং এগুলোর কোন কল্পিত ব্যাখ্যা করা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ কবরে ছালাত আদায়ের বিষয়টি কেবল নবীদের সাথে খাছ। অন্যদের ব্যাপারে নয়। কারণ মৃত্যুর পর কোন ইবাদত নেই। তাছাড়া কবরস্থানে ছালাত আদায় করা নিষেধ।[২৯] তাহলে তারা কিভাবে সেখানে ছালাত আদায় করছেন? অতএব তা দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে মিলানো যাবে না।

তৃতীয়তঃ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কেউ দরূদ ও সালাম পাঠালে ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর কাছে পাঠানো হয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁর মাঝে রূহ ফেরত দিলে সালামের উত্তর দেন। কবর থেকে রাসূল (ছাঃ) নিজে সরাসরি শুনতে পেলে কেন উক্ত মাধ্যমের প্রয়োজন হয়? অতএব দুনিয়ার মানুষের কোন কথা সরাসরি কেউ কবর থেকে শুনতে পায় না এটাই চূড়ান্ত। আল্লাহ চাইলে কাউকে শুনাতে পারেন। এটার তাঁর ইচ্ছাধীন।[৩০] কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, তাবলীগ জামায়াতের ফাযায়েলে আমল বইয়ের হজ্জ ও দরূদ অংশে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর নিয়ে এত যে মিথ্যা ঘটনা লেখা আছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। অতএব উক্ত বই থেকে সাবধান!

চতুর্থতঃ সাধারণ মানুষকে কবরে রাখার পর লোকেরা যখন চলে আসে তখনও মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়। উক্ত মর্মেও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[৩১] এছাড়া মুমিন

১৩. আবু নু'আইম, আদ-দালায়েল, পৃঃ ৫। সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬১।
১৪. শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ৩২৬।
১৫. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮২।
১৬. ইমাম সুয়ূত্বী, আল-লাইলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃঃ ২৪৯।
১৭. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫।
১৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৩০৩।
১৯. তিরমিযী হা/৩৬০৯; আহমাদ হা/; মিশকাত হা/৫৭৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৫৬।
২০. মুসলিম হা/৬৯১৯; মিশকাত হা/৭৯।
২১. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬১।
২২. মুসনাদে বাযযার হা/৬৮৮৮; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৪২৫; বায়হাক্বী, হায়াতুল আম্বিয়া, পৃঃ ৩; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬২১; ফাযায়েলে দুরুদ শরীফ, পৃঃ ৩৪; (উর্দূ), পৃঃ ১৯।
২৩. ছহীহ মুসলিম হা/৬৩০৬, 'মর্যাদা' অধ্যায়, 'মূসা (আঃ)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৪২।
২৪. ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৮, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭।
২৫. আবুদাঊদ হা/১০৪৭ ও ১৫৩১; মিশকাত হা/১৩৬১ ও ১৩৬৬।
২৬. আবুদাঊদ হা/২০২১; মিশকাত হা/৯২৫, সনদ হাসান।
২৭. বুখারী হা/৩৮৮৭; মিশকাত হা/৫৮৬২।
২৮. মুসলিম হা/৪৪৮।
২৯. বুখারী হা/১৩৩০; মিশকাত হা/৭১২।
৩০. ফাত্বির ২২; যুমার ৫২; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮।
৩১. বুখারী হা/১৩৩৮; মিশকাত হা/১২৬।

ব্যক্তিকে কবরে বসানোর সাথে সাথে আছরের ছালাত আদায় করতে চায়।[৩২] কিন্তু কুরআন-হাদীছ থেকে এর বেশী কিছু জানা যায় না। তাই যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে।

মূলতঃ উক্ত বিষয়গুলো কোনটিই দুনিয়াবী জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত হাদীছগুলো জানা সত্ত্বেও তাঁরা কখনো কবরের কাছে চাননি কিংবা তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করেননি এবং তাঁকে অসীলা মেনে দু'আও করেননি। বরং দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের কাছে না গিয়ে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে দু'আ চেয়েছেন। কারণ কবরে যাওয়ার পর দুনিয়ার সাথে যেমন কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনি কারো কোন উপকার বা ক্ষতিও করতে পারেন না। যেমন-

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের মাঝে পড়ত তখন ওমর (রাঃ) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানি প্রার্থনা করতাম আপনার নবীর মাধ্যমে। আপনি আমাদের পানি দিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদেরকে পানি দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর পানি হত।[৩৩]

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ কবরের কাছে গিয়ে নবী (ছাঃ)-কে অসীলা ধরে দু'আ করতেন না। অথচ তাঁর কবর তাঁদের নিকটেই ছিল। বরং তাঁরা জীবিত ব্যক্তি হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচার কাছে গিয়ে দু'আ চাইতেন। লক্ষণীয় হল, যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ) কবর থেকে তাঁর ছাহাবীদের কোন উপকার করতে না পারেন, তবে পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি আছে যে কবর থেকে মানুষকে উপকার করতে পারবে?

সুধী পাঠক! বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ হায়াতুন্নবীতে বিশ্বাসী। এমনকি তথাকথিত পীর-ফকীর ও ওলীরা কবরে জীবিত থাকে বলে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকে। উক্ত শিরকী আক্বীদা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

(৯) মুহাম্মাদ (ছাঃ) গায়েব জানতেন :

দেশের অধিকাংশ মানুষ উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী। এ জন্যই নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বিভিন্ন মীলাদের মজলিসে হাযির কারানোর জন্য পৃথক চেয়ার রাখা হয় (নাঊযুবিল্লাহ)।

পর্যালোচনা :

এটি মহা অন্যায়। কারণ বিষয়টি সরাসরি আল্লাহর সাথে জড়িত। মানুষ হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে জড়িত নয়। আল্লাহ ব্যতীত অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ أَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ. 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং তারা এটাও বুঝে না যে তারা কখন পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ৬৫)*। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন, قُلْ لَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ. 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি গায়েব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যা কিছু ওহীরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি' *(আন'আম ৫০)*।

উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না, তবে তাঁকে অহির মাধ্যমে যা জানানো হত তিনি তাই বলতেন। অন্য আয়াতে এসেছে, وَلَا أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ 'আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে এবং আমি গায়েবের খবর রাখি না' *(হূদ ৩১)*।

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ.

'আপনি বলুন! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবে সম্পর্কে জানতাম তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতাম। আর কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা' *(আ'রাফ ১৮৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ. 'আকাশ ও যমীনের অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন' *(হূদ ১২৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ.

'গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়। স্থল ও জলভাগের সব কিছুই তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতও ঝরেনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না, এমনি ভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয় না। সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(আন'আম ৫৯)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানেন তাহলে সে মিথ্যা বলবে।[৩৪]

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতেও একশ্রেণীর মানুষ বিশ্বাস করে রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন (নাঊযুবিল্লাহ)। এর মূল কারণ হল, তারা মাযারে বসে বিনা পুঁজির যে ব্যবসা চালু রেখেছে তা যেন জমজমাট রাখা যায়। যারা খানকায় বসে সাধারণ জনগণের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তারাই উক্ত শিরকী আক্বীদা চালু রেখেছে। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে পূর্বে জানা থাকলে তাঁকে কষ্ট স্বীকার করতে হত না। (চলবে)

৩২. ইবনু মাজাহ হা/৪২৭২, সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৩৮।
৩৩. ছহীহ বুখারী হা/১০১০, ১/১৩৭ পৃঃ।
৩৪. ছহীহ আল-বুখারী হা/৭৩৮০।

সোনামণি সংগঠন : বাস্তবায়নের পদ্ধতি

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

মুখবন্ধ :

মহান আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মতরাজির মধ্যে গোলাপের মত অন্যতম নে'মত আমাদের অতি আদরের প্রাণপ্রিয় 'সোনামণিরা'। আমরা জানি, 'সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন'। সোনামণিদেরকে শিশু ও কিশোর বয়স থেকে যদি ইসলামী আদর্শে সঠিক পরিচর্চার মাধ্যমে গড়ে তোলা না হয়, তবে তারা আধুনিক বিজ্ঞানের ইন্টারনেটের যুগের পারিপার্শ্বিক অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হবে। ফলে তারা আদর্শচ্যুত ও বিপথগামী ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে পরিবার সমাজ ও দেশের বোঝা ও ক্ষতিকর কীটে পরিণত হবে। পরবর্তীতে হাযার চেষ্টা করেও তাদেরকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। ফুলের মত পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ সোনামণিদেরকে পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতের আলোকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্লাটফর্ম হচ্ছে 'সোনামণি সংগঠন'। তাই আসুন, আমরা আমাদের পরকালীন মহাসাফল্যের জন্য ও সুন্দর ভবিষ্যতের স্বার্থে 'সোনামণি' সংগঠন বাস্তবায়নের আলোর পথ খুজি। সোনামণিদের চরিত্র সুন্দর হলে ভবিষ্যতে আমরা পাব আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার, সুশৃংখল সমাজ ও দেশ তথা শান্তিময় পৃথিবী। সোনামণি সংগঠনপ্রিয় এদেশের আপামর সকলকে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সঙ্গে থেকে মেধা, মনন, অর্থ, সময় ও শ্রম প্রদানে বিনম্র আবেদন রাখছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

সোনামণি সংগঠন বাস্তাবায়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত ১০টি বিষয় অত্যাধিক গুরত্বপূণ ঃ

১. আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।
২. উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন।
৩. সাংগঠনিক ও পারিবারিকভাবে নিয়মিত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ও মাসিক বৈঠকের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
৪. সাধ্যানুযায়ী নিয়মিত সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ প্রদানের মানসিকতা অর্জন করা।
৫. ইসলামী রুচি সম্মত সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদের আবশ্যকতা।
৬. সোনামণিদের নিয়মিত উৎসাহিতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
৭. যথাযথ ইসলামী জ্ঞানার্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।
৮. দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক গুণাবলী অর্জন করা।
৯. নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা
১০. সোণামণি সংগঠনের সাথে অন্যান্য শিশু-কিশোর সংগঠনের পার্থক্য সম্পর্কে জানা। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন :

কোন সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মূল নিয়ামক শক্তি হল আনুগত্য। সোনামণি সংগঠনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, নেতা ও কর্মীদের আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। সামাজিক যত প্রকার রীতি-নীতি আছে, তার যথাযথ সফলতার জন্য আনুগত্যই হচ্ছে প্রথম ধাপ। সংগঠন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যেমন সংগঠনের প্রয়োজন, তেমন ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের জন্য আনুগত্য অপরিহার্য। এক্ষেত্রে শরীকবিহীনভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। পাশাপাশি মুসলিম তাক্বওয়াশীল ও নিরহংকারী আমীর বা নেতার আনুগত্যও করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের আমীরের আনুগত্য কর; অত:পর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয়, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তা ফিরিয়ে দাও; যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ট' *(নিসা ৪/৫৯)*।

একটি সংগঠন বাস্তবায়নের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট হল, সকল পর্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়া। যে সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ নেতৃত্বের প্রতি যতবেশী আনুগত্যশীল হবে, সে সংগঠন ততবেশী মযবুত ও গতিশীল হবে এবং তাদের পক্ষে যে কোন কঠিন, জটিল ও দুরূহ কাজ সম্পাদন করা অতি সহজ হবে। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর বিজ্ঞ ও সৎ নেতৃত্বের আনুগত্য করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য হবে শর্তহীনভাবে এবং আমীরের আনুগত্য হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের শর্ত সাপেক্ষে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى أَمِيرِى فَقَدْ عَصَانِى.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফারমানী করল, সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল এবং যে আমার আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল।[৩৫] অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যদি কেউ তার নেতাকে অপসন্দনীয় কিছু করতে দেখে, তবে তার ধৈর্যধারণ করা উচিৎ। কেননা যে কেউ ইসলামী জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যবরণ করল।[৩৬] অন্য হাদীছে

৩৫. বুখারী হা/২৯৫৭, মুসলিম হা/৪৮৫২, মিশকাত হা/৩৬৬১।
৩৬. বুখারী হা/ ৭১৪৩, মুসলিম হা/৪৮৯৭ মিশকাত হা/৩৬৬৮।

বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদয় কর, রামাযানের ছিয়াম পালন কর, ধন-সম্পদের যাকাত প্রদান কর, নেতার আনুগত্য কর এবং তোমার প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর।[৩৭]

ভাল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। তিনি বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে পরস্পকে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা' *(মায়েদা ৫/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ 'পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সৎ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য'।[৩৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদের ৫টি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। ১. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ২. আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা ৩. তাঁর আনুগত্য করা ৪. প্রয়োজনে হিজরত করা ও ৫. আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।[৩৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ 'যখন তিনজন একত্রে সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন আমীর (নেতা) নিযুক্ত করে নেয়'।[৪০] ছালাতের জামা'আতে যেমন ইমাম ও মুক্তাদী এক সূত্রে বাঁধা, ঠিক তেমনি সংগঠন অর্থই হচ্ছে আনুগত্যের মন্ত্রে বাঁধা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী একদল ছাহাবী বা সাথী গড়তে পেরেছিলেন, ফলে অন্ধকার সমাজ আলোকিত ও সোনালী সমাজে পরিণত হয়েছিল। অতএব আনুগত্যশীল এক ঝাঁক নেতা, কর্মী ও দায়িত্বশীল তৈরী করতে পারলেই এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'সোনামণি' সংগঠন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে ইনশাল্লাহ।

উষার মরুর ধুসর বুকে, বিশাল যদি শহর গড়
একটি জীবন সফল করা, তার চেয়ে অনেক বড়।

২. উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন :

উত্তম চরিত্র গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল সাংগঠনিক শৃংখলা বজায় রাখা। সাংগঠনিক শৃংখলার মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে পারে। বর্তমান সমাজে উত্তম চরিত্রের বড়ই অভাব। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ আজ কলুষিত। অথচ মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে উত্তম চরিত্রে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে উপর প্রতিষ্ঠিত' *(ক্বলম ৬৮/৪)*। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে সর্বোত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে চরিত্রের দিক থেকে উত্তম'।[৪১]

সাংগঠনিক শৃংখলা বলতে এখানে সংগঠন পরিচালনা ও বাস্ত বায়নের নীতিমালাকে বুঝানো হয়েছে। প্রতিদিন লেখাপড়া, কাজ ও চাকুরী জীবনের পাশাপাশি পরকালীন মুক্তির জন্য সংগঠনকে মন ও মগজের সর্বোচ্চ স্থানে আসীন করতে হবে। রুটিন অর্থাৎ নিয়ম মাফিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন খুবই সহজ হয়। আমাদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ভাইকে ইসলামী ও সাংগঠনিক বক্তৃতার সাথে সাথে জুম'আর খুৎবা প্রদানে সক্ষম ও অভ্যস্ত হতে হবে। এ জন্য সোনামণি ও দায়িত্বশীলদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে গড়ে তুলতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الأَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

নাওয়াস ইবনু সাম'আম (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূল (ছাঃ)-কে পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরে তিনি বলেন, পূণ্য হল উত্তম চরিত্র। আর পাপ হল, যে কাজে তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং মানুষের নিকট তা প্রকাশ পাওয়াকে তুমি অপসন্দ কর।[৪২] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাত্রিতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারী এবং দিনে নফল ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে।[৪৩]

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا شَىْءٌ أَثْقَلُ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَ لَيَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىءَ.

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে আমলটি রাখা হবে, তা হল উত্তম চরিত্র। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলভাষী দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।[৪৪] তাই আসুন, আমরা সকলেই আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করি এবং 'সোণামণি' সংগঠন বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখি। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

৩. সাংগঠনিক ও পারিবারিকভাবে নিয়মিত সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/মাসিক বৈঠকের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা :

আমাদের যারা দায়িত্বশীল, তাদের পরিবারই এক একটি সংগঠন। তাই প্রত্যেকটি পরিবার ও সংগঠনের জন্য সাপ্তাহিক বৈঠক অপরিহার্য। এই বৈঠকের মাধ্যমে আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিশু-কিশোর তথা যুবকদের চরম চারিত্রিক অবক্ষয় রোধে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে প্রকৃত ইসলামী সমাজ গঠন ও জ্ঞান আহরণের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এই 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক'। এটি 'সোণামণি'

৩৭. তিরমিযী হা/৬১৬, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৬৭, সনদ ছহীহ।
৩৮. বুখারী হা/৭২৫৭, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫।
৩৯. আহমাদ হা/১৭৮৩৩, তিরমিযী হা/২৮৬৩, মিশকাত হা/৩৬৯৪, সনদ ছহীহ।
৪০. আবুদাউদ হা/২৬০৮, মিশকাত হা/৩৯১১, সনদ হাসান।
৪১. বুখারী হা/৩৫৫৯, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০৭৫।
৪২. মুসলিম হা/৬৬৮০, মিশকাত হা/৫০৭৩।
৪৩. আবুদাউদ হা/৪৭৯৮, মিশকাত হা/৫০৮২, সনদ ছহীহ।
৪৪. তিরমিযী হা/২০০২; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৩২, সনদ ছহীহ।

সংগঠন বাস্তবায়নের মৌলিক কাজ। এক্ষেত্রে শাখা সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি শাখার দায়িত্বশীলগণ প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে মসজিদে যাওয়া ও আসার সময় সোনামণিদের সাথে সালাম, মুছাফাহা ও কুশল বিনিময় করবে। অতঃপর টার্গেট ভিত্তিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলে সোনামণিদেরকে নিয়মিত মুছল্লী বানানোর চেষ্টা করা ও সমাজসেবা মূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। পরিশেষে সংগঠনের সদস্যভুক্ত হওয়ার আহ্বান করা। সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ ও আদর্শ দেশ গড়ার ভিত্তি স্থাপিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا 'একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু হতে উত্তম।'[৪৫]

পরামর্শভিত্তিক কার্য সম্পাদনের গুরুত্ব বর্ণনায় আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 'যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, ছালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে' *(শূরা ৪২/৩৮)*। পরিবারের সাথে বসবাসরত সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও সোনামণিদের পারিবারিক সাপ্তাহিক/পাক্ষিক/ মাসিক নিয়মিত তা'লীমী বৈঠকের সুব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। তাহ'লে পুরা পরিবারটাই সাংগঠনিক রূপ নিবে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সোনামণিদের উপযোগী করে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিলে অতি সহজে তারা অনেক কিছু শিখতে পারে। তার কতিপয় দিক উল্লেখ করা হ'ল :

⌘ পানি খাওয়ার নিয়ম ৫টি। যথা : ১. ডান হাতে গ্লাস ধরা ২. বসা, ৩. বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা ৪. তিনি নিঃশ্বাসে পান করা এবং ৫. পান করা শেষে আলহামদুলিল্লাহ' বলা। এখানে ১০/১৫ টি বড় বড় হাদীছ পাঠ করে শুনালে তারা আসলে তেমন কিছুই শিখতে পারবে না, তেমনি এটা তাদের জন্য রপ্ত করা অনেক কষ্টকর হবে।

⌘ **নিয়মিত সাপ্তহিক বৈঠকের উপকারিতা নিম্নরূপ :** সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের কতিপয় উপকারিতা রয়েছে। যেমন : ১. সাংগঠনিক জীবনের হাতে খড়ি হয় ২. জ্ঞানের প্রসার ও প্রখরতা বৃদ্ধি পায় ৩. নেতৃত্ব সৃষ্টি করে ৪. সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয় ৫. আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয় ৬. দাওয়াতী কাজে উৎসাহিত করে ৭. দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি ও উপায় শিক্ষা দেয় ৮. দারস ও বক্তৃতার প্রশিক্ষণ হয়। ৯. আমল সংশোধন হয় ১০. পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় ১১. অতুলনীয় জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় ১২. পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব হয় ১৩. খোলামেলা আলোচনার অভ্যাস ও সাহস গড়ে উঠে ১৪. সত্যিকারে দ্বীনের খাদেম ও মুজাহিদ হিসাবে গড়ে উঠা সম্ভম হয়। তাই আসুন! আমরা সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠকের অনুশীলন করি এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ি।

৪৫. বুখারী হা/২৭৯২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৯২।

৪. সাধ্যানুযায়ী নিয়মিত সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ প্রদানের মানসিকতা অর্জন করা :

ইসলামে নিয়মিত আমলের গুরুত্ব অনেক বেশী। যে কোন উত্তম কাজ নিয়মিত করা বাঞ্ছনীয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَىُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتِ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ.

মাস্‌রূক্ব (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন্ কাজ সর্বাধিক প্রিয় ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, যে কোন আমল নিয়মিত করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি রাতের ছালাত আদায় করতে কখন উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাক শুনতে পেতেন।[৪৬] উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ) অল্প হলেও উত্তম আমল নিয়মিত করা পসন্দ করতেন। আল্লাহ প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ তাদের অনুসারী ছাহাবী ও সাথীগণ এবং ঈমানদার ব্যক্তিগণ কখনো বৃথা সয় নষ্ট করা পসন্দ করতেন না। তাঁরা সর্বদা ভাল কাজে সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ ব্যয় করেছেন। আর ভাল কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 'কোন ব্যক্তি সৎ কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কোন ব্যক্তি অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তার প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না' *(আন'আম ৬/১৬০)*।

সংগঠনকে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে সময় দিলে বছরে ৩৬৫ দিনে ৩৬৫ ঘন্টা সময় দেওয়া হবে। এভাবে কোন দায়িত্বশীল যদি ১০ বছর সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে তার মর্যাদা কত হবে আপনি চিন্তা করে দেখুন। এভাবে একটু একটু করে অল্প শ্রমে ও স্বল্প ব্যয়ে সাংগঠনিক কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনই হল দক্ষতা। একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি অহেতুক গল্প থেকে নিজেকে বিরত রাখে না, বরং অবসরের সাথে সাথে ভাল কথা-বার্তা ও দ্বীনী আলোচনায় মশগুল থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ، أَوْ لِيَسْكُتْ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে' *(বুখারী হা/৬৪৭৬; মুসলিম হা/১৮৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২)*। রাসূল (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে'।[৪৭]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন মানুষ মরে যায় তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি আমল ব্যতীত। যথা : ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়া (খ) এমন জ্ঞান, যার দ্বারা

৪৬. বুখারী হা/১১৩২; নাসাঈ হা/১৬১৬; মিশকাত হা/১২০৭।
৪৭. বুখারী হা/৮৯৩; মুসলিম হা/৪৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

(মানুষের) উপকার সাধিত হয় এবং (গ) এমন সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে।[৪৮] অতএব সোণামণি সংগঠন বাস্তবায়নের অন্যতম পন্থা হচ্ছে সাধ্যমত সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ ব্যয় করা। এগুলি উপরোক্ত হাদীছটির আলোকে ছাদাক্বায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। হে আল্লাহ, তুমি এ দেশের সামর্থবান সকলকে এ সংগঠনের জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের মানসিকতা তৈরী করে দাও। আমিন!

'সোনামণি এক ফুটন্ত গোলাপের নাম,
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ার সংগ্রাম'।

৫. ইসলামী রুচিসম্মত সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদের আবশ্যকতা : মহান আল্লাহ নিজে অতীব সুন্দর। তিনি সুন্দর ও সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন। আমাদের প্রিয় নবীও সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে আজীবন লালন করেছেন। ঈমান আনার পর ইসলামের সর্বপ্রথম ফরয হল পোশাক। মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য হল পোশাক। ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের পোশাকের ব্যাপারে কতকগুলো নীতিমালা দিয়েছে। শালীনতা বজায় রেখে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে পুরুষ ও মহিলাগণ ভদ্র পোশাক পরতেন। পোশাক সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ .

'হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই অবতীর্ণ করেছি এমন পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে ও অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং তাক্বওয়ার পোশাক। এটি সর্বোত্তম। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নিদর্শন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর' *('আরাফ ৭/২৬)*। উক্ত আয়াতে পোশাকের ৩টি গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। যথা : ১. পোশাক লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে ২. এটি সাজ-সজ্জা হবে এবং ৩, তাক্বওয়ার পোশাক হবে। এটি সমগ্র বিশ্ব মানবতার জন্য, শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়। তাই আমাদের সোনামণিদেরকে শালীনতা যেন বজায় থাকে এমন পোশাক পরিধান করাতে হবে। পোশাক আঁটসাট, ছোটখাটো ও ফিটফাট হবে না। পোশাক তুলনামূলক ঢিলেঢালা ও লম্বা হবে, যা শরীর ঢেকে রাখে ও ভদ্রতার পরিচয় দেয়। আর এ বিষয়ে পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ সংগঠনের দায়িত্বশীলদেরকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক ইবাদতের স্থানে (ছালাতের সময়) সুন্দর পোশাক পরিধান কর। আর খাও ও পান কর কিন্তু অপচয় কর না। কেননা আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না *('আরাফ-৩১)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যা ইচ্ছা তাই পরিধান কর যতক্ষণ না দু'টি জিনিস তোমাদেরকে ভুল করিয়ে দেয়। তা হল : ১. অপব্যয় ২. অহংকার বা দাম্ভিকতা।[৪৯] অপব্যয় আর অহংকার না থাকলে খাওয়া ও পোশাকের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

উত্তম পোশাকের কতিপয় গুণাবলী :
১. শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ও ডান দিক থেকে পরিধান করা।[৫০]
২. পরিষ্কার পরিছন্ন, ভদ্র ও মার্জিত পোশাক পরিধান করা।[৫১]
৩ পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক ও স্বর্ণালংকার নিষেধ। তবে মহিলাদের জন্য তা জায়েয।[৫২]
৪. টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা ছেলেদের জন্য নিষেধ তবে মেয়েদের জন্য তা জায়েয।[৫৩]
৫. ছেলেদের জন্য মেয়েদের এবং অমুসলিমদের পোশাক পরিধান করা নিষেধ। আর মেয়েদের জন্য ছেলেদের এবং অমুসলিমদের পোশাক পরিধান করা নিষেধ।[৫৪]
৬. নতুন পোশাক পরিধান কালে দো'আ পাঠ করা এবং পোশাক খোলার সময় বাম দিক দিয়ে খোলা ও বিসমিল্লাহ বলা।[৫৫]
৭. মেয়েদের রূপ-লাবন্য বৃদ্ধির জন্য চুল ও ভ্রু ছোট করা, উপড়ে ফেলা, দাঁত চিকন করা ও ফাঁক করা, মাথায় কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা। উলকি নিজে আঁকা বা অন্যকে আঁকিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নিষেধ।[৫৬] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। এক ব্যক্তি বললেন, সুন্দর পোশাক ও জুতা পরা যাবে কি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ অবশ্যই বেশী সুন্দর। তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে অবজ্ঞা করা।[৫৭] আমাদের সোনামণি সংগঠনের সকল প্রকার দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশমত ইসলামী পোশাক পরিধানে সোনামণিদেরকে উৎসাহিত করা এবং অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। *(চলবে)*

[লেখক : প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি]

৪৮. মুসলিম হা/৭৩১০; তিরমিযী হা/১৩৭৬; মিশকাত হা/২০৩।
৪৯. বুখারী, ২/৮৬০ পৃঃ, 'পোশাক' অধ্যায়-৮১।
৫০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯।
৫১. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮।
৫২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩২১।
৫৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩১১-৪৩১৪।
৫৪. বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯।
৫৫. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩, সনদ হাসান।
৫৬. বুখারী হা/৫৯৩১; মিশকাত হা/৪৪৩১।
৫৭. মুসলিম হা/২৭৫; মিশকাত হা/৫১০৮।

সফল কর্মীর আচরণবিধি

- *অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন*

(পূর্ব প্রকাশের পর)

মুমিন জীবন সফলতার, ব্যর্থতার নয়। অহি প্রতিষ্ঠার সংগঠনের কর্মীরা পিচ্ছিল পথ ও কাঁটা বিছানো রাস্তা অতিক্রম করে সফলতার চূড়ান্ত ঠিকানা জান্নাতের দিকে এগিয়ে যায়। এভাবেই তার সার্বিক সফলতার যাত্রা শুরু হয়। আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 'নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়' *(আ'লা ৮৭/১৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'যে নিজেকে শুদ্ধ করে সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ মনোরথ হয়' *(আশ-শামস ৯১/৯-১০)*।

২২. আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা :

কর্মীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আচরণ হল আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শতভাগ আন্তরিকতা থাকা। পৃথিবীর অন্যান্য কাজ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, জাতি বা দেশের জন্য করা যেতে পারে; ব্যক্তি স্বার্থ ও ব্যক্তিগত লাভের যাবতীয় দিক সম্ভবনা সহকারে সম্পাদন করা যেতে পারে, পার্থিব সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালিত করা একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী কাজ। যে পর্যন্ত মানুষের সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে যথার্থ ও গভীর না হয় এবং সে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য কাজ করতে মনস্থ না করে, সে পর্যন্ত এ কাজে কোন প্রকার সাফল্য সম্ভব নয়। কারণ এখানে মানুষ তার সার্বিক জীবন পবিত্র অহি দ্বারা পরিচালনা করতে চায়। আর এ জন্য সব কিছু আল্লাহর জন্য করা প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কাজে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই কাম্য। একমাত্র আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনই এ কর্মের মূল প্রেরণা হতে হবে। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম মাধ্যম হল ছালাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত সম্পন্ন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 'তোমরা সিজদা কর এবং আমার নিকটবর্তী হও' *('আলাক্ব ৯৬/১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِيْ رَبَّهُ 'অবশ্যই তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ছালাত আদায় করে তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাত করে' *(ছহীহ বুখারী হা/৫৩১)*। অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, বান্দা যখন সিজদায় থাকে তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা বেশী বেশী দো'আ কর[৫৮] সুতরাং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থায়ী করার প্রধানতম মাধ্যম হ'ল ছালাত। যা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা একজন কর্মীর আচরণে সর্বদা উপস্থিত থাকা যরূরী।

৫৮. ছহীহ মুসলিম হা/১১১১; আবুদাঊদ হা/৮৭৫; মিশকাত হা/৮৯৪।

২৩. আখেরাতের চিন্তা করা :

কর্মীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ হল সর্বদা আখেরাতের কথা চিন্তা করা। যদিও দুনিয়াই মুমিনের কর্মস্থল এবং সবকিছু তাকে এখানেই করতে হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে এ দুনিয়ার জন্য কাজ করে না। আখেরাতের জন্য করে এবং দুনিয়ার ফলাফলের দিকে তার লক্ষ্য থাকে না; বরং তার লক্ষ্য থাকে আখেরাতের প্রতি। যেসব কাজ আখেরাতে লাভজনক সেসব তাকে করতে হবে। অনুরূপ যেসব কাজের ফলে আখেরাতের কোন লাভ হবে না সেগুলো তাকে ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার যেসব লাভ আখেরাতে ক্ষতিকর, সেগুলো তাকে বর্জন করতে হবে। আর দুনিয়ার যেসব ক্ষতি আখেরাতে লাভ জনক সেগুলো তাকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে একমাত্র আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার কোন শাস্তি ও পুরস্কারের গুরুত্ব তার কাছে থাকা উচিত নয়। এ দুনিয়ায় তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে সফলতা বা ব্যর্থতা যারই সম্মুখীন হোক তার প্রশংসা বা নিন্দা যাই করা হোক, যে পুরস্কার লাভ করুক বা পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হোক, সকল অবস্থায় তাকে এ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত যে, সে আল্লাহ্র জন্য এ পরিশ্রম করছে তার দৃষ্টি থেকে কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই এবং তার নিকট আখেরাতের চিরন্তন পুরস্কার পাওয়া থেকে সে কোন ক্রমেই বঞ্চিত হবে না এবং সেখানকার সাফল্যই হচ্ছে আসল সাফল্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا 'নিশ্চয়ই পরকালই হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন- وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ 'আখিরাতের আবাসই উত্তম এবং তা মুত্তাক্বীদের জন্য কতই না সুন্দর আবাস' *(নাহল ১৬/২২)*।

মানুষ মৃত্যুবরণ করলেই সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায় না; বরং মৃত্যু ব্যক্তি আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং তার আরেক নতুন জীবন শুরু হয়। আর সেটাই প্রকৃত জীবন এবং চিরস্থায়ী চির অনন্ত জীবন। আল্লাহ বলেন, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 'নিশ্চয়ই পরকালীন জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত' *('আনকাবূত ২৯/৬৪)*। তিনি আরো বলেন, يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ 'হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবন হচ্ছে সামান্য। আর অবশ্যই আখিরাত হল চিরস্থায়ী ও চিরন্তন আবাসস্থল' *(মুমিন ৪০/৩৯)*। وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'আখিরাত হল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৭)*। অন্যন্য বলেন, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى 'অবশ্যই আখিরাত হবে আপনার জন্য দুনিয়া থেকে উত্তম' *(যোহা ৯৩/৪)*।

২৪. প্রশিক্ষণ নেওয়া ও দেওয়া :

প্রশিক্ষণ নেওয়া ও দেওয়া সফল কর্মীর অন্যতম আচরণ। প্রশিক্ষণের আভিধানিক অর্থ হ'ল, কোন বিশেষ বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত বানানো বা হওয়া।

প্রশিক্ষণের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল- Training. কলকাতা থেকে প্রকাশিত Samsad English-Bengali Dictionary-তে Training মানে বলা হয়েছে- 'To prepare or be prepared for performance by instructions, practice, exercise, diet, etc'. 'To instruct and discipline'. 'To direct or aim'.

মূলতঃ সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও পেশাগত বিশেষ জ্ঞান, তথ্য, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুক্তিসংগত ও বাস্তবধর্মী কার্যক্রমই হল প্রশিক্ষণ।

আই. এল. ও (ILO) কনভেনশনে প্রশিক্ষণের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে, 'The Special Kind of teaching and instiuction in which goals are clearly determind and are usually and readily demonstrated and call for a degree of mastery."

প্রশিক্ষণ মূলতঃ মানব জীবনের সকল ক্ষেত্র ও সকল কর্মের সাথেই সম্পৃক্ত। সকল কাজেরই প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে যারা আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাদেরকে প্রশিক্ষণ নেওয়া ও দেওয়া অত্যন্ত যরূরী। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয়াবলী অর্জন করা যায় তা নিম্নরূপ :

১. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ২. দায়িত্ব পালনে পারদর্শিতা উন্নয়ন ৩. দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সংশোধন ও উন্নয়ন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি ৪. আচরণ সংশোধন ও উন্নয়ন ৫. তথ্য আহরণ, তথ্য সমৃদ্ধি ও জ্ঞানোন্নয়ন ৬. নৈতিক ও চারিত্রিক মনোন্নয়ন ৭. আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ৮. পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ৯. আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টি ১০. ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ১১. কর্মকৌশল উন্নয়নে প্রায়োগিক দক্ষতা সৃষ্টি ১২. দূরদর্শী, গতিশীল, চৌকস, সুশৃংঙ্খল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে সাহায্য করা ১৩. যোগাযোগ ও মটিভেশনের দক্ষতা সৃষ্টি ১৪. শিক্ষাদানে পারদর্শিতা সৃষ্টি ১৫. কাঙ্খিত ও প্রত্যাশিত মনোন্নয়ন ১৬. সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জটিলতা নিরসন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা সৃষ্টি ১৭. সচেতনতা সৃষ্টি ১৮. সেবা করার যোগ্যতা ও মানসিকতা সৃষ্টি ১৯. মেযাজের ভারসাম্য সৃষ্টি ২০. গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাওয়া।

উল্লেখিত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদান সকল কর্মক্ষেত্রে বা সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। বাস্তবে যদি আমরা দেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সেক্টরে তাকায় তাহলে আমরা আরও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, দেশ রক্ষায় যে সকল বাহিনী যেমন, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী কাজ করেন তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন দক্ষ সদস্য হিসাবে গড়ে উঠতে হয়। ব্যাংক সেক্টর, ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিতদের, শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত জনশক্তি প্রশাসনিক সেক্টরগুলো, মিডিয়াসহ সকল স্তরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন করে তোলা হয়। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে যোগ্য ও খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি তার বাস্তব প্রমাণ। হাদীছে এসেছে, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى 'তোমরা ছালাত সেই ভাবে পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ'।[৫৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যেন তোমরা পরহেযগারীতা অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

২৫. দেশপ্রেমিক :

দেশের একজন সুনাগরিক হিসাবে অন্যতম কর্তব্য হল, দেশকে ভালবাসা, দেশের কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করা। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলে উহা রক্ষার্থে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা। বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জিহাদে শরীক হয়ে দেশকে হেফাযত করা। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ 'তোমরা বের হয়ে পড় হালকা ও ভারী (অস্ত্রসহ) অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ কর' *(তওবা ৯/৪১)*।

২৬. মানুষের ভাল গুণগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা :

সমাজে অনেক শ্রেণী ও পেশার মানুষ বসবাস করে। অনেকের মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণীয় আচরণ লক্ষ্য করা যায়, যেগুলো অনুসরণ করা যরূরী। কিন্তু কারো খারাপগুণ খুঁজে বের করা সফর কর্মীর বৈশিষ্ট্য নয়। তবে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে একান্ত আপনজনের মতো কাউকে সংশোধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। মূলতঃ কাজ হল মানুষের ভাল গুণ দেখা। অতঃপর সেগুলোকে বিকশিত করার চেষ্টা করা। একজন মালি, ফুল বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও ফুল ফুটানোর ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করে, সফর কর্মী অন্য সকলের ব্যাপারে সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করবে।

২৭. নাম মনে রাখা :

একজন ব্যক্তিকে সনাক্ত করার উত্তম মাধ্যম হল তার নাম। তাই সকল কর্মীর সর্বোত্তম আচরণ হল বেশী বেশী মানুষের নাম স্মরণে রাখা। একই আদর্শের ও আন্দোলনের সহকর্মীদের নামতো অবশ্যই স্মরণ থাকা উচিত। তাছাড়া সাধারণ ও অসাধারণ সব ধরণের মানুষের নাম মনে রাখার চেষ্টা করা। অতঃপর পুনরায় যখন দেখা হবে তখন তার সুন্দর নাম ধরে ডাকা এবং তার সাথে ভাই যোগ করে ডাকা। ফলে উক্ত ব্যক্তির মনে রেখাপাত করবে এবং পূর্বের চেয়ে বহুলাংশে আকৃষ্ট হবে। এজন্য একজন সফল কর্মীকে অন্য সহপাঠীদের নাম স্মরণ রাখার জন্য স্মৃতির প্রখরতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজনে স্মৃতির পাতায় নামের তালিকা তৈরী করতে হবে। অতঃপর যাদের নাম নিজের স্মৃতির ফাইলে সংরক্ষিত তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া। বিশেষ করে সাক্ষাতে বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া এবং তাদের কল্যাণে আল্লাহ্‌র কাছে সর্বদা দো'আ করা।

---

৫৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩।

২৮. সদা সক্রিয় ও সচেতন থাকা :

সফল কর্মী তার মহান উদ্দেশ্য অর্জনে সর্বদা সক্রিয় ও সচেতন থাকবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাছিলের প্রচেষ্টায় নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখবে ও অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাই একজন কর্মীর জীবনাভিধান থেকে 'শিথিলতা', 'নীরবতা', 'নিষ্ক্রিয়তা', 'অসচেতনতা' ইত্যাদি শব্দ মুছে ফেলতে হবে।

২৯. বাধাগ্রস্ত হলে ভগ্ন মনোরথ না হওয়া :

মুমিন জীবনের সফলতা একটি চিরন্তন। দ্বীনী কাজে বাধাগ্রস্ত হওয়া আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যহত থাকবে। কিন্তু কর্মী হিসাবে সফল। যদিও নেকীর একটু ঘাটতি হবে। তাই আল্লাহর উপর ভরসা করে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে। ভেঙ্গে পড়া যাবে না। চিন্তিত, মনভাঙ্গা ও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা চলবে না। এগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক পথে আরো সতেজ ও সক্রিয় হতে হবে। তাছাড়া হতাশা মুমিনের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'তোমরা হীনবল হয়ো না, দুঃখিত হয়ো না, ঈমানদার হলে তোমরাই শ্রেষ্ঠ' *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

৩০. কর্মীদের অবদানকে স্বীকার করা :

কর্মীর অবদানকে মূল্যায়ন করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মানসিকতা থাকতে হবে। সহকর্মী তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বীরত্ব, ধন ও শ্রম দিয়ে অভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যে সহযোগিতা করছে এজন্য তার জন্য অন্তরখোলা দো'আ করা, তার প্রশংসা করা, হাসিমুখে কথা বলা একান্ত যরূরী, যাতে সে উৎসাহবোধ করে। প্রয়োজনে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, ইসলামী সাহিত্য, ডাইরী, কলম ইত্যাদি উপহার দেওয়া। ফলে আরো প্রাণবন্ত ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করবে। মনে রাখতে হবে যে, সহকর্মীরা নিঃসন্দেহে ব্যক্তির জন্য নয়, বরং আল্লাহর জন্য ও তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। দায়িত্বশীল তাদের প্রতিনিধি কিংবা পরিচালক মাত্র। তাই তাদের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া ও শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে কখনো তাদের কোন কাজকে ছোট মনে করে অবহেলা করা যাবে না।

৩১. শৃঙ্খলা প্রিয় হওয়া :

আল্লাহ তা'আলা বিশৃঙ্খলা তৈরী করা পসন্দ করেন না। তিনি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করাকে মুমিন জীবনের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা এতে কেবল বিশৃঙ্খলাকারীরাই নয় বরং সমাজের সকল শ্রেণীর লোক আক্রান্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'তোমরা এমন ফাসাদকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই শাস্তিদানে কঠোর' *(আনফাল ৮/২৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ 'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফেৎনা দূরিভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে যালিমদেরকে ব্যতীত আর অন্যদেরকে আক্রমণ করা চলবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৯৩)*।

ফেৎনা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশৃঙ্খলার চেয়ে আল্লাহ তা'আলা আইনসঙ্গত মৃত্যুদণ্ডকে শ্রেয় বলে ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ 'বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও জঘন্য' *(বাক্বারাহ ২/১৯১)*। অতএব সফল কর্মীর আচরণে এটা যেন সূর্যের ন্যায় পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় যে, সে নিজে শৃঙ্খলা মেনে চলবেন, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কাজ করবেন এবং কোথাও বিশৃঙ্খলা তৈরী না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

৩২. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকা :

সফলকর্মীর উল্লেখযোগ্য আচরণ হল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কেননা যথাসময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে। কর্মী যদি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে তবে অধঃস্তন জনশক্তিকে কখনই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আচরণটি কর্মীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

৩৩. বিশ্লেষণের অনুভূতি লাভ করা :

কর্মী যে মানচিত্রে বসবাস করে, যে সমাজে চলাফেরা করে, যে সংগঠনের সাথে আছে তার প্রত্যেকটি বিষয়ের ও অবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতে হবে। যথাসময়ে তার বিশ্লেষণ যদি ভুল হয় তবে কর্মীর সফলতায় কালো পর্দা নেমে আসবে। অতএব সঠিক বিশ্লেষণ করে সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণই তাকে পৌঁছে দিবে সফলতার স্বর্ণশিখরে।

৩৪. পদলোভী না হওয়া :

ইসলামী আন্দোলনে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এ জন্য পৃথিবীতে যেমন ঝুঁকি থাকে, তেমনি পরকালে ও সমূহ বিপর্যয়ের সম্ভবনা রয়েছে। দায়িত্ব পালন সঠিকভাবে না করলে দায়িত্বহীনতার জন্য সংশ্লিষ্ট নেতার কাছে জবাবদিহি করতে হয়। আর আখিরাতে এ অপরাধের জন্য আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সে জন্য কোন মুসলিম বা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী স্বেচ্ছায় দায়িত্বপূর্ণ কোন পদপ্রার্থী হতে পারে না। এটা অন্যায় এবং ক্ষমতা অপব্যবহারের আগাম ইঙ্গিত। সে জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আচরণই হবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। কেননা পদ বা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষ যে কোন অন্যায় করতে পারে। এ বিষয়ে কর্মীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘোষণা সর্বদা সতর্কতার সাথে মনে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন- إِنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ 'আল্লাহর কসম! আমরা এমন ব্যক্তিকে কখনোই আমাদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করব না, যে নিজে প্রার্থনা করে বা তার জন্য লালায়িত থাকে'।[৬০]

৩৫. অফিস পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনা করা :

একজন সফল কর্মীর আচরণবিধিতে অফিস পরিচালনার দক্ষতা থাকা একান্ত যরূরী। অফিস পরিচিতি, অফিসের কার্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখিত হল :

৬০. ছহীহ মুসলিম হা/৪৮২১; মিশকাত হা/৩৬৮৩।

অফিস (Office) একটি ইংরেজি শব্দ। যার বাংলা অর্থ হল কার্যালয় বা দফতর। অবশ্য অফিস (Office) শব্দটি সর্বজনবোধ্য হওয়ায় বাংলাতে বহুল ব্যবহৃত। প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকগণ বা কর্মচারীগণ যেখানে বসে সংগঠন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তাকে অফিস বলে। অফিস সম্পর্কে অধ্যাপক হাস্ট-এর মত হল, 'সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের যে প্রধান কার্যালয় হতে যাবতীয় নির্দেশনাবলী দেওয়া হয় এবং যেখানে উক্ত নির্দেশসমূহের ফলাফল নিরূপিত হয় ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয় তাকে অফিস বলে'। বি.বি ঘোষ-এর মতে, `Office is the seat of administration where policy decisions are taken and from where all the organization are directed'.

সুতরাং কর্মী যে স্তরের হোক না কেন তাকে কেন্দ্র, যেলা, উপযেলা, এলাকা, মহানগর, পৌরসভা, শহর, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় অফিসের কার্যাবলী সম্পর্কে দক্ষতা থাকতে হবে। অফিসের কার্যাবলী প্রধানতঃ দুইটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে : (ক) অফিসের নিয়মিত কার্যাবলী (খ) অফিসের প্রশাসনিক কার্যাবলী। যেমন

(ক) অফিসের নিয়মিত কার্যাবলী :

১. তথ্য সংগ্রহ ২. তথ্য সংরক্ষণ ৩, তথ্য বিশ্লেষণ, ৪. আসবাবপত্র সংরক্ষণ ৫. কাজের রুটিন প্রণয়ন ৬. প্রচার ৭. স্টেশনারী ও মনিহারি দ্রব্য সংগ্রহ ৮. হিসাব সংরক্ষণ ৯. যোগাযোগ ১০. নথিকরণ ইত্যাদি।

(খ) অফিসের প্রশাসনিক কার্যাবলী :

১. পরিকল্পনা প্রণয়ন ২. নিয়ন্ত্রণ ৩. সমন্বয় সাধন ৪. আইন-কানূন, নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলার অনুসরণ ৫. সদস্য সংগ্রহ ৬. কর্মী প্রশিক্ষণ ৭. আসবাবপত্র নির্বাচন ৮. ফরম প্রস্তুত ও নিয়ন্ত্রণ ৯. ঝুঁকি হ্রাস।

উল্লেখিত 'ক' ও 'খ' অংশের কার্যাবলী পরিচালার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেজিস্ট্রার ও ফাইল পত্রের সাথে কর্মীর ভালভাবে পরিচিত থাকতে হবে। তাহলে অফিস পরিচালনার দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে।

৩৬. মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা :

ইসলাম একটি মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 'অনুরূপভাবে আমি তোমাদের মধ্যমপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানুষ জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ করা হবে' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। সুতরাং ইসলাম এমন একটি মধ্যপন্থী ধর্ম, যাতে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের কোন স্থান নেই। এটি একটি ন্যায়ানুগ জীবন ব্যবস্থা, যা সর্বব্যাপী। এতে একটি দিক বাদ দিয়ে অন্যদিককে ধারণ করা হয়েছে, বা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এমন নয়; বরং সকল দিককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মীর জীবনে যত দিক ও বিভাগ আছে তার প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগে মধ্যপন্থা থাকা যরূরী। চাই সেটা ঈমানের ক্ষেত্রে হোক কিংবা কর্ম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হোক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হোক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হোক, আবেগ-অনুভূতির ক্ষেত্রে হোক কিংবা বিচার-ফায়ছালা ও সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে হোক। মধ্যপন্থা অবলম্বন করা কর্মীর অন্যতম আচরণ। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি নবী কারীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বন্ধুর সাথে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বজায় রাখ (বাড়াবাড়ি কর না), হতে পারে সে একদিন তোমার শত্রু হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শত্রুর সাথে স্বাভাবিক শত্রুতা বজায় রাখ (আধিক্য দেখিও না), হতে পারে একদিন তোমরা বন্ধু হয়ে যাবে।[৬১]

৩৭. সত্যবাদী হওয়া ঃ

মুমিন জীবন আর সত্যবাদিতা কখনো আলাদা হতে পারে না। মুমিন মানেই তাকে সত্যবাদী হতে হবে। সে যেমন ছয়টি সত্যের উপর বিশ্বাস রেখে মুমিন হয়েছে, তেমনি ভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সত্যের ওপর অবিচল ও অটুট থাকতে হবে। মুমিন শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিই দেয় না। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস রেখে কাজের মাধ্যমে বাস্তব প্রমাণ দেয়। মূলতঃ মৌখিক স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস এবং তা কাজের সমন্বয়কারীকেই বলা হয় মুমিন। এ সমন্বয়ের ওপরই মুমিনের যাবতীয় কাজ ও চরিত্র নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ' *(হুজুরাত ৪৯/১৫)*।

একজন ব্যক্তি যখন সে নিজেকে সত্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইবে তখন তার ওপর প্রথম যে কর্তব্যটি বর্তাবে তাহল, সে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী করে নিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার স্বাভাবিক বিধান হল, যে যেমন চরিত্রের অধিকারী তার সঙ্গী-সাথীও তেমনই জুটিয়ে দেন। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ঝোঁক প্রবণতা এবং আগ্রহ অনুসারেই তার সঙ্গী জুটে।

মুমিন হয় মুমিনের বন্ধু আর কাফির হয় কাফিরের বন্ধু। মুমিনের হৃদয়ের বন্ধন থাকে আরেকজন মুমিনের হৃদয়ের সাথে। সুতরাং কর্মীর আচরণে সত্যবাদিতা অবশ্যই থাকতে হবে এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে শামিল হতে হবে। আল্লাহ্র ঘোষণা- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী হও' *(তওবা ৯/১১৯)*।

৩৮. হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, মৃদু হাসি ও শীতল চক্ষু সম্পন্ন হওয়া :

এই আচরণ একজন সফল কর্মীর অমূল্য সম্পদ। এমন গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির পাশে মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে। তার পরশে এসে প্রশান্তি লাভ করে। তাছাড়া চক্ষু ব্যক্তির আকর্ষণ। চোখের চাহনি মানুষের হৃদয়কে বিগলিত করে। কিন্তু যে চোখ চৈত্রের খরার মত তা কি মানুষের মনকে শীতল করে? দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সমাজের অনেক মানুষের চেহারায় এমন কুৎসিত ছাপ পড়ে থাকে যার কারণে মানুষ তার পাশে যেতে চায় না। কখনো কেউ কাছে আসলেও তার অশালীন ভাষা, রুক্ষ ব্যবহার, কর্কশ বাক্য, অশ্রাব্য বকাবকি তাকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে আর

৬১. তিরমিযী হা/১৯৯৭; আদাবুল মুফরাদ হা/১৩২১; ছহীহুল জামে' হা/১৭৮, সনদ ছহীহ।

কখনো তার ধারে কাছে আসে না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মাঝে এই স্বভাবের সমাবেশ বেশি ঘটে। একজন সফল কর্মীর মাঝে এ ধরণের স্বভাব থাকা খুবই নিন্দনীয়। হাদীছে এসেছে,

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি লোকটিকে দেখে বললেন, সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক এবং সমাজের দুষ্ট সন্তান। এরপর সে যখন এসে পড়ল, তখন নবী করীম (ছাঃ) আনন্দ সহকারে তার সাথে মেলামেশা করলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যখন আপনি লোকটিকে দেখলেন তখন তার ব্যাপারে এমন বললেন, পরে তার সাথে আপনি আনন্দচিত্তে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি কখন আমাকে অশালীন দেখেছ? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার দুষ্টামির কারণে মানুষ তাকে ত্যাগ করে *(ছহীহ বুখারী হা/৬০৩২; মিশকাত হা/ ৪৮২৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনু হারেছ ইবনে জাযই (রাঃ) বলেন مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক মুচকি হাসতে দেখিনি'।[৬২]

৩৯. মূর্খতার জবাবে যুক্তিপূর্ণ কথা বলা :

মূর্খ বলতে অশিক্ষিত বা লেখাপড়া জানে না, অক্ষর জ্ঞান নেই এমন লোককে বুঝানো হয়নি। বরং মুর্খ বলতে এমন লোককেই বুঝানো হয়ে থাকে, যাদের মধ্যে দ্বীনদারিতার কোন জ্ঞান নেই, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যারা জাহেলী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবার উদ্যোগ নিয়েছে এবং কোন সভ্য-ভদ্র ও দ্বীনদারি লোকের সাথে অশালীন ব্যবহার করে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী কর্মীর আচরণ হবে, তারা এসব মূর্খ লোকদের গালি বা অশালীন ব্যবহারের জবাবে গালি বা অশালীন ব্যবহার এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করবে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে মুমিন বান্দারা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 'তারা যখন কোন বেহুদা কথা শোনে, তখন তারা উপেক্ষা করে যায় এবং বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চায় না' *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*।

একজন কর্মী সর্বদা ভাল আচরণ দিয়েই মন্দ আচরণের মোকাবেলা করে থাকে। কেননা যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ভদ্রতা ও মানবতাবোধ থাকে সে যদি মন্দের মোকাবেলায় ভাল আচরণ দেখতে পায় তাহলে সে খারাপ আচরণে আর স্থির থাকতে পারে না। বরং তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার পরিবর্তে ভালবাসা ও মমতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র ঘোষণা, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 'ভাল ও মন্দ সমান হাতে পারে না। ভাল দিয়েই মন্দের মোকাবেলা কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উয়াইনা ইবনে হিসন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ্র শপথ, আপনি আমাদের বেশী দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে ইনছাফের সাথে ফায়ছালা করেন না। এ কথায় ওমর (রাঃ) ক্রোধান্বিত হলেন, এমন কি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন; তখন (হিসন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র) হুর ইবনে কায়েস (রাঃ) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা তার নবী (ছাঃ)-কে বলেছেন, 'ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন কর, ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং মুর্খদের এড়িয়ে চল' *('আরাফ ৭/১৯৯)*। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ আয়াত শুনে ওমর (রাঃ) আর অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ শুনা মাত্রই সর্বাধিক অনুগত হয়ে যেতেন।[৬৩]

৪০. আল্লাহ্র দেওয়া সীমা রক্ষা করা :

সূর্য উদিত হওয়ারর মধ্য দিয়ে দিন শুরু হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে দিন শেষ হয়। অর্থাৎ রাতের আগমন ঘটে আবার সূর্য উদিত হওয়ার মধ্য দিয়ে রাত শেষ হয় অর্থাৎ দিনের যাত্রা শুরু হয়। এ রুটিন হল মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনেরই কর্মের ও হুকুমের বহিঃপ্রকাশ। এ রাত আর দিনের আলোকেই মানুষকে তার কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হয়। এ কর্মসূচী একেকজন একেক পন্থায় সম্পাদন করে থাকে। কেউ সম্পাদন করে বিভিন্ন দার্শনিক, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীকে কেন্দ্র করে, কেউ সম্পাদন করে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র ও দলকে কেন্দ্র করে, আবার কেউ সম্পাদন করে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র সীমারেখাকে কেন্দ্র করে। আর যারা আল্লাহ্র দেওয়া সীমারেখায় তাদের দিনাতিপাত করে থাকে তারাই হল মুমিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 'তারা (মুমিনরা) আল্লাহ্র দেওয়া সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর মুমিনদের জন্য সুসংবাদ' *(তওবা ৯/১১২)*।

কর্মী ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র দেওয়া সীমা রেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছাকৃত নিজেদের জীবন পরিচালনা করে না। এখানে আল্লাহ্র দেওয়া সীমারেখা বলতে, আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ ও তার হুকুম-বিধানকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা, আনুগত্য-অনুসরণ, ঈমান-আক্বীদা, নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিকতা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি, পরাষ্ট্রনীতি, মুসলিম-অমুসলিম সম্পর্ক, একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক কথায় মানব জীবনের রান্নাঘর থেকে পল্লী ভবন পর্যন্ত, বিদ্যালয় থেকে আদালত পর্যন্ত, ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের জন্য একমাত্র বিধানদাতা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যে নীতি-নির্ধারণ করেছেন সেই নীতি নির্ধারণই হল আল্লাহ্র দেওয়া সীমারেখা।

---

৬২. তিরমিযী/৩৬৪১; মিশকাত হা/৪৭৪৮; সনদ ছহীহ।

৬৩. ছহীহ বুখারী হা/৪৬৪২।

কর্মী এই সীমার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে দিনাতিপাত করবে। নিজের ব্যক্তিগত হোক অথবা সমষ্টিগত হোক সকল কর্মকাণ্ড এই সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখবে। কখনো এ সীমা অতিক্রম করে ইচ্ছামত কাজ করবে না। আবার কখনো আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মনগড়া আইনকে বা মানুষের তৈরী করা ভিন্নতর আইনকে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের কে সতর্কমূলক ভাষা দিয়ে অবগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে চাই, তার সে পদ্ধতি কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের (ব্যর্থ, আশাহত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত) অন্তর্ভুক্ত' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

দ্বীনকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যথেষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন মুমিনদের গলায় প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও বন্দেগীর শৃঙ্খল নেই। এখন আক্বীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন মুমিনরা একমাত্র আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারী, ঠিক তেমনি কর্ম জীবনেও আল্লাহ্‌র ছাড়া আর কারোর আনুগত্যকারী নয়। আল্লাহ্‌র ঘোষণা-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (জীবনব্যবস্থা)-কে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। আমার নে'মত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে দিয়েছি' *(মায়েদা ৫/৩)*।

৪১. পর্যালোচনা করা :

দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মী একজন মুমিন। মুমিন ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাসী। ঈমানের পরিভাষিক সংজ্ঞায় হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে বলা হয়েছে-

الايمان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص عن المعصية-

'ঈমান হল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র ঘোষণা-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন পাঠ করা কালাম/কুরআন, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে' *(আনফাল ৮/২)*। অন্যত্র তিনি বলেন-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 'তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনী সমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(ফাতাহ ৪৮/৪)*।

আলোচনা দ্বারা একথা পরিষ্কার করে বলা যায়, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে কর্মীর কাজের গতি কখনো গতিশীল হয় আর কখনো মন্থর হয়। কর্মীর আচরণে 'পর্যালোচনা' বিষয়টি অবশ্য থাকা যরূরী। কারণ পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মীর কাজের প্রকৃত মান নির্ণীত হয় এবং ভবিষ্যৎ সফলতার পথ সুগম হয়। কর্মীর কাজের যতগুলো দিক ও বিভাগ আছে তার প্রত্যেকটির পর্যালোচনা করে সফলতা ও ব্যর্থতার দিকগুলো চিহ্নিত করা। চিহ্নিত করা কিভাবে সফলতা এসেছে এবং কী কী কারণে কিছুটা হলেও ব্যর্থতা এসেছে? চাই সেটা আর্থিক ক্ষেত্রে, কর্মী যোগাযোগের ক্ষেত্রে, দাওয়াতী ক্ষেত্রে কিংবা সাংগঠনিক মযবুতির ক্ষেত্রে হোক। জানুয়ারী ২০১৩ সালে সংগঠনের সামগ্রিক অবস্থা কেমন ছিল এবং ডিসেম্বর ২০১৩ সাংগঠনিক অবস্থা কেমন তা পর্যালোচনার মাধ্যমে কর্মীকে নিরূপণ করতে হবে। এ আচরণবিধি সংগঠনের সকলস্তরের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের থাকা যরূরী।

পরিশেষে বলতে চাই, উল্লেখিত আচরণ সম্পন্ন কর্মীদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ, যে সমাজ পৃথিবীর বুকে বিশ্ব মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজো পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, শোষণ মুক্ত ভীতিহীন ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি আলোচ্য আচরণগুলো আমাদের চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হই। হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে আলোচ্য আচরণগুলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার তাওফীক্ব দান করুন। আমিন!

[লেখক : আরবী বিভাগ, হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]
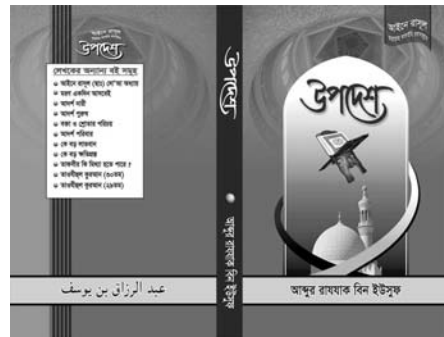
জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত সমূহ

-বযলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশের পর)

জান্নাতের দালানকোটা ও প্রাসাদসমূহ :

জান্নাতের প্রাসাদসমূহ হবে বহুতল ও একাধিক কক্ষবিশিষ্ট। তা হবে সৌন্দর্যময় ও চির সুখের স্থান। জান্নাতীরা জান্নাতের এই সুন্দর ও নান্দনিক প্রাসাদসমূরে মধ্যে বসবাস করবে। তাছাড়া উক্ত দালানগুলো যাবতীয় ছোট-বড় অপবিত্রতা ও ময়লা-আবর্জনা থেকে সম্পূর্ণ পুতঃপবিত্র থাকবে। আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

'আল্লাহ তা'আলা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের এমন জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকবে। তারা সেখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আর এই চিরন্তন আবাসস্থলে থাকবে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র প্রাসাদসমূহ। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড় আর এটাই হ'ল মহা পুরস্কার' *(তওবা ৯/৭২)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيعَادَ

'কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে বহুতলা বিশিষ্ট প্রাসাদসমূহ। যার উপর আরো বহু প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে, যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, এটা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নয়' *(যুমার ৩৯/২০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا 'তাদের ধৈর্যশীলতার দরুন তাদেরকে দেওয়া হবে জান্নাতের প্রাসাদসমূহ, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে' *(ফুরক্বান ২৫/৭৫)*।

জান্নাতীদের জন্য জান্নাতে বিরাটকায় অট্টালিকা বা প্রাসাদসমূহ থাকবে। যার ইট হবে স্বর্ণ-রৌপ্যের নির্মিত। থাকবে স্বণ ও চাঁদি নির্মিত উদ্যানসমূহ এবং বিশাল বিশাল নয়াভিরাম সৌধ। সেখানে চন্দন কাঠ জ্বলতে থাকবে, যার কারণে সুঘ্রাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। সেখানে তারা প্রত্যেক শ্বাস-নিশ্বাসে আল্লাহ্র প্রশংসাগীত রচনা করবে। জান্নাতীরা কখনো বার্ধক্য হবে না, সর্বদা চিরস্থায়ীভাবে যুবক থাকবে। জান্নাতের মাটি হবে মিশকে আম্বরের সুঘ্রাণযুক্ত, কংকর হবে মণি-মুক্তা খচিত এবং ঘাস হবে সুদৃশ জাফরানের। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ ...قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ وَلاَ يَبْأَسْ وَيُخَلَّدْ وَلاَ يَمُوتْ لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ...

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সৃষ্টি জগতকে কী দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, পানি দিয়ে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাত কী দিয়ে নির্মিত হয়েছে? উত্তরে তিনি বললেন, তার একটি ইট স্বর্ণের অন্যটি চাঁদির। আর সিমেন্ট সুগন্ধিযুক্ত মিশকে আম্বরের। এর কংকর মণি-মুক্তার। মাটি জাফরানের। যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সেখানে সে জীবন-যাপন করবে কিন্তু কোন কষ্ট তার দৃষ্টিগোচর হবে না। চিরকাল জীবিত থাকবে, মৃত্যুবরণ করবে না। পরিধেয় কাপড় কখনো পুরাতন হবে না। আর তাদের যৌবনও কখনো ফুরিয়ে যাবে না...।[৬৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِى جَنَّةِ عَدْنٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দু'টি উদ্যান হবে রৌপ্যের, যার পাত্র ও সকলকিছু হবে রৌপ্যের। দু'টি উদ্যান হবে স্বর্ণের। যার পাত্র ও সকলকিছু হবে স্বর্ণের। মানুষের জন্য জান্নাতে আদনে আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না। তবে একমাত্র আল্লাহ্র অহংকারের চাদর থাকবে, যা তার চেহারার উপর থাকবে।[৬৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ...ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে মি'রাজের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ...আমাকে অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল। সেখানে মণি-মুক্ত নির্মিত গম্বুজ রয়েছে এবং তার মাটি হ'ল মিশকে আম্বরের।[৬৬]

জান্নাতের প্রাসাদ বা অট্টালিকা পাওয়ার মাধ্যম :

জান্নাতের প্রাসাদ বা অট্টালিকা পাওয়ার গুণাবলী আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

৬৪. তিরমিযী হা/২৫২৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬২; ছহীহুল জামে' হা/২১১৬, সনদ ছহীহ।

৬৫. ছহীহ বুখারী হা/৪৮৭৮ ও ৭৪৪৪; ছহীহ মুসলিম হা/৪৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৮৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৬৯৭; ইবনু হিব্বান হা/৭৩৮৬; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৭৩৩১।

৬৬. ছহীহ বুখারী হা/৩৩৪২; ছহীহ মুসলিম হা/৪৩৩; মিশকাত হা/৫৮৬৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২১৩২৬; ইবনু হিব্বান হা/৭৪০৬।

(١) عَنْ عَلِى رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا تُرَى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ اِلَيْهِ اَعْرَابِىُّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ هِىَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلاَمَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَادَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلّٰهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতে এমন কতগুলি বালাখানা রয়েছে, যার ভিতর থেকে বাহির দেখা যায় এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যায়। একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এমন জান্নাত কোন্ ব্যক্তির জন্য? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যারা মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য খাওয়ায়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করে।[৬৭] জান্নাতে সবচেয়ে উন্নত মানের বালাখানাগুলি এত স্বচ্ছ পদার্থ ও শৈল্পিক কারুকার্য দ্বারা তৈরী যে, তার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর দেখা যাবে। আর এর জন্য চারটি কাজ করা যরূরী। ১. মানুষের সাথে নরমভাবে কথা বলতে হবে ২. ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষকে খাদ্য খাওয়াতে হবে ৩. নিয়মিত নফল ছিয়াম পালনে অভ্যাসী হ'তে হবে এবং ৪. রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে হবে।

(٢) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.

(২) উম্ম হাবীবাহ (রাঃ), যিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যহ দিনে বার রাক'আত সুন্নাত বা নফল ছালাত আদয় করবে, তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মান করবেন।[৬৮] উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা গেল, দৈনিক বার রাক'আত সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করলে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বা অট্টালিকা তৈর করা হবে।

(٣) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ.

(৩) মাহমুদ ইবনু লাবীদ থেকে বর্ণিত, ওছমান বিন আফফান (রাঃ) মসজিদ (নববী নতুন করে) তৈরী করার ইচ্ছা পোষণ করলে মানুষ তা অপসন্দ করে। বরং তারা ওটাকে তার নিজস্ব স্থানে ছেড়ে দেওয়াকে ভাল মনে করে। তখন ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[৬৯]

(٤) عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِى فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللهُ ابْنُوا لِعَبْدِى بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

(৪) আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, আমার বান্দার সন্তানের জান ছিনিয়ে এনেছ? ফেরেশতারা তখন বলেন, হ্যাঁ। তিনি আবার বলেন, তোমরা কি তার হৃদয়ের টুকরাকে ছিনিয়ে এনেছ? ফেরেশতাগণ বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তখন আমার বান্দা কী বলেছে? ফেরেশতাগণ বললেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়াইন্না ইলাইহি রা-জেঊন' পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, যাও। তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর। যার নাম হবে 'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর।[৭০]

(٥) عَنْ أَبِى أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

(৫) আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি জান্নাতে গৃহের নেতা। যে ব্যক্তি ন্যায়ের স্বপক্ষে থেকেও তর্ক পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক হলেও যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি উন্নত বা উত্তম চরিত্রের অধিকারী তার জন্য জান্নাতের উপরিভাগে একটি গৃহ নিমার্ণ করা হবে।[৭১]

(٦) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

(৬) সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি যখনই বাজারে প্রবেশ করে তখন বলে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ

---

৬৭. তিরমিযী হা/২৫২৭, সনদ হাসান।

৬৮. ছহীহ মুসলিম হা/১৭২৯; আবুদাঊদ হা/১২৫০; মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৮১৮; দারেমী হা/১৪৩৮; ইবনু খুযায়মাহ হা/১১৮৫; ছহীহুল জামে' হা/৫৭৩৬।

৬৯. মুসলিম হা/১২১৮; ইবনু মাজাহ হা/৭৩৮; মুসনাদে আহমাদ হা/৪৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৯৯; ছহীহুল জামে' হা/৬১৩০।

৭০. তিরমিযী হা/১০২১; ইবনু হিব্বান হা/২৯৪৮; মিশকাত হা/১৭৩৬; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৯২৭; ছহীহুল জামে' হা/৭৯৫, সনদ হাসান।

৭১. আবুদাঊদ হা/৪৮০০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৩, সনদ ছহীহ।

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ বলবে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, দশ লক্ষ গোনাহ মাফ করে দেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করেন।[৭২]

জান্নাতের নদীসমূহ

জান্নাতের নদী আর পৃথিবীর নদী সমান নয়। পৃথিবীর নদীসমূহের পানি প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়া পান কর বা ব্যবহার করা যায় না। পক্ষান্তরে জান্নাতের পানি কোন কিছু করা ব্যতীতই পান করা যায়। জান্নাতী নদীর পার্শ্বে নয়নাভিরাম নান্দনিক সবুজাভ বৃক্ষ থাকবে। যা দেখলে নয়ন জুড়াবে। জান্নাতের অনেকগুলো নদী রয়েছে। যেমন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِى الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ وَالدُّرِّ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কাওছার একটি জান্নাতী নদীর নাম। যার উভয় তীর স্বর্ণ নির্মিত। তার পানি ইয়াকুত ও মোতির উপর প্রবহমান। তার মাটি মিশক আম্বারের চেয়ে বেশী সুগন্ধিময়। তার পানি মধু অপেক্ষা সুমিষ্ট এবং বরফ অপেক্ষা স্বচ্ছ ও শুভ্র।[৭৩]

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِى الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ.

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, (মি'রাজের সময়) আমি জান্নাত দেখতে ছিলাম। সেখানে আমি একটা নদী দেখতে পেলাম, যার উভয় তীরে মোতি তৈরী গম্বুজ রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এগুলো কী? তিনি বললেন, এ হ'ল কাওছার নদী, যা আপনাকে আপনার প্রভু দিয়েছেন। আর তার মাটি বা সুগন্ধি মিশকে আম্বারের ন্যায়।[৭৪] কাওছার নদীর পানি দুধ থেকে সাদা এবং মধু থেকে অধিক মিষ্টি হবে। আর এই কাওছার নদী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে উপঢৌকন দিবেন। যেমন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ يَعْنِى فِى الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا.

আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞাসিত হলেন যে, কাওছার কী? উত্তরে তিনি বললেন, এটা একটি নদী, যা জান্নাতে আল্লাহ আমাকে দান করবেন। যার পানি দুধের চেয়ে সাদা হবে, মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে এবং সেখানে পাখি থাকবে, যাদের গর্দান হবে উটের ন্যায়। ওমর (রাঃ) তখন বললেন, ঐ পাখিরা খুবই আনন্দে রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, ঐ পাখিগুলোকে ভক্ষণকারী আরো আনন্দে রয়েছে।[৭৫]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ خِيَامُ اللُّؤْلُؤِ فَضَرَبْتُ بِيَدِى إِلَى مَا يَجْرِى فِيهِ الْمَاءُ فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِى أَعْطَاكَهُ اللهُ.

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, জান্নাতের নদীর পার্শ্বে মণিমুক্তা খচিত তাঁবু রয়েছে। অতঃপর আমার হাত দিয়ে তাতে আঘাত করলে সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হ'ল, যা মিশকে আম্বরের চেয়ে সুগন্ধিময়। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটা কী? তিনি বললেন, এটা কাওছার নদী, যা আল্লাহ আপনাকে দান করবেন।[৭৬]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, সাইহান, জাইহান, ফুরাত ও নীল জান্নাতের নদী।[৭৭] *(ক্রমশঃ)*

---

৭২. ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; তিরমিযী হা/৩৪২৮; মিশকাত হা/২৪৩১; হাকিম হা/১৯৭৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৩৯; ছহীহুল জামে' হা/৬২৩১, সনদ হাসান।

৭৩. ইবনু মাজাহ হা/৪৩৩৪; তিরমিযী হা/৩৩৬১; ছহীহুল জামে' হা/৪৬১৫, সনদ ছহীহ।

৭৪. ছহীহ বুখারী হা/৬৫৮১।

৭৫. তিরমিযী হা/২৫৪২; মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৫০৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫১৪, সনদ ছহীহ।

৭৬. মুসনাদে আহমাদ হা/১২০২৭; মুসনাদে আবী ইয়ালা হা/৩৭২৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৬৫, সনদ ছহীহ।

৭৭. ছহীহ মুসলিম হা/৭৩৪০; মুসনাদে আহমাদ হা/৭৮৭৩; মিশকাত হা/৫৬২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১০; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৫২।

Contents

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (ক)

دور الجديد : المرحلة الثانية (الف)

জিহাদ আন্দোলন ১ম পর্যায় শহীদায়েন (রহঃ)

حركة الجهاد للشهيدين

(১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) ৫২ বৎসর

পৃথিবীর বুকে এযাবত সৃষ্ট যেকোন সংস্কার প্রচেষ্টা মূলতঃ দু'ভাবেই সম্পাদিত হয়েছে। ১- চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে ২- রাজনৈতিক বিজয় সাধনের মাধ্যমে। প্রথমোক্তটিই সর্বাপেক্ষা মোক্ষম হাতিয়ার এবং স্থায়ী ফলদানকারী। দ্বিতীয়টি ক্ষণস্থায়ী এমনকি স্থায়ী হলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের নৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে অন্যূন সাড়ে ছয় শো বছরের মুসলিম শাসন (১২০৬-১৮৬২ খৃঃ) ও প্রায় দু'শো বছরের (১৭৫-১৯৪৭ খৃঃ) ইংরেজ শাসন উক্ত ব্যর্থতার বাস্তব দলীল।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ যে যুগে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, সেযুগে রাজধানী দিল্লীসহ সারা উপমহাদেশের ইসলামের চরম দুর্দিন ছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দিল্লীর মুসলিম সিংহাসন যেমন হিন্দু, মারাঠা ও ইংরেজ শক্তির হুমকির সম্মুখীন ছিল, ধর্মীয় দিক দিয়েও তেমনি মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনগণের অধিকাংশ চরম দেউলিয়াত্বের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যাপক নৈতিক ধ্বস নামার ফলে তাদের মধ্যে সর্বত্র হীনমন্যতার রোগ সংক্রমিত হয়ে পড়েছিল। এজন্য এসময় প্রয়োজন ছিল এমন একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনির, যা ঘুমন্ত মুসলিম জনগণের ঈমানী চেতনা জীবিত করতে পারে এবং মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক তথা সার্বিক জীবন এক সর্বব্যাপী বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। এ সময় শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে সেই চেতনা সৃষ্টি করে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি এযাবতকালের অনুসৃত তাক্বলীদী জড়তার বিরুদ্ধে যেমন আমল বিল-হাদীছের তূর্যধ্বনি করেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ইসলামী ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে জিহাদের বাস্তাব পথনির্দেশ দান করেছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া পথেই পরবর্তীতে সৃষ্টি হয় ব্যাপকভিত্তিক জিহাদ আন্দোলন ও সেই সাথে শুরু হয় ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে আমল বিল-হাদীছ তথা আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার। পরবর্তীতে সশস্ত্র জিহাদ বন্ধ হয়ে গেলেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের জিহাদ আজও জারি (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد و نية. رواه مسلم عن عائشة ح ١٨٦٤) আছে। যেহেতু জিহাদ আন্দোলন ও আহলেহাদীছ আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেকারণ এক্ষনে আমরা 'জিহাদ আন্দোলন' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২)-এর বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪) কর্তৃক বৃটিশ-ভারতকে 'দারুল হরব' বা যুদ্ধ এলাকা ঘোষণার বাস্তব ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত উপমহাদেশে শতাধিক বর্ষব্যাপী জিহাদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অলিউল্লাহ্- পৌত্র স্বনামধন্য আলিম শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ৩৩তম অধঃস্তন পুরুষ আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল বিন শাহ আব্দুল গীণ (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১) এবং টোংকের নওয়াব আমীর খান পিন্ডারীর সেনাবাহিনীতে দীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সমরকুশলী যোদ্ধা রায়বেরেলীর সাইয়িদ আহমাদ (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১ খৃঃ) এই জিহাদের নেতৃত্ব দান করেন।

সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী আমীর খানের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তাকে তিনি তাঁর অনুসারী বানাতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি পরে ইংরেজের সংগে আপোষ করায় সাইয়িদ আহমাদ ক্ষুব্ধ হন এবং ভারতের সীমান্ত অঞ্চলে থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন ভারতের ইল্মী রাজধানী দিল্লীর অলিউল্লাহ পরিবারের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে সেখনে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, সাইয়িদ আহমাদ মাদরাসা রহীমিয়াতে ইতিপূর্বে দু'বছর লেখাপড়া করেছিলেন। তাছাড়া টোংকের সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন মাঝে মধ্যে অনেক চাঁদা আদায় করে তিনি এই মাদরাসায় প্রেরন করতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে অলিউল্লাহ পরিবারে একটি উচ্চ ধারণা পূর্ব থেকেই বিরাজ করেছিল। তিনি দিল্লীতে এলে উস্তাদ মাওলানা শাহ আব্দুল আযীযের ইঙ্গিতে মাওলানা আব্দুল হাই ও মাওলানা শাহ ইসমাঈল তঁর হাতে জিহাদের রায়'আত গ্রহণ করেন।[৭৮] এর পর থেকেই শুরু হয় ভবিষ্যত সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতিপর্ব।

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি :
শাহ ইসমাঈল ৮ বৎসর বয়সে কুরআন মাজীদ হেফ্য করেন। ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত আরবী ছরফ-নাহুর প্রাথমিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। ১০ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হ'লে চাচা শাহ আব্দুল কাদের-এর নিকটে লালিত-পালিত হন। এরপর বড় চাচা শাহ আব্দুল আযীয-এর নিকটে 'মা'কূলাত ও মানকূলাত'-এর উপরে দক্ষতা অর্জন করেন। দাদা শাহ অলিউল্লাহ লিখিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'-র বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে তিনি সক্রিয় জিহাদী জীবন বেছে নেন এবং অবশেষে বালাকোট প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন ও সেখানেই সমাহিত হন। জীবনীকার নওমাহরাভী বলেন, 'যদি আজ খোদ শাহ ছাহেব বেঁচে থাকতেন, তবে তাঁকেও শাহ ইসমাঈলের পতাকাতলে দেখা যেত।'

গ্রন্থবলীঃ তাঁর লেখনী কম ছিল। কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত সারগর্ভ ও সংস্কারধর্মী। যেমন- (১) তাক্বভিয়াতুল ঈমান -উর্দূ (২) সালূকে নূর, তাওহীদী কবিতা -উর্দূ ও ফারসী (৩) এক রোযী -উর্দূ (৪) আবাক্বাত -আরবী (৫) ছিরাতে মুস্তাক্বীম (প্রথমার্ধ)-ফারসী (৬) ঈযাহুল হাক্বক্বিছ ছারীহ-ফারসী (৭) উছূলুল ফিক্হ -আরবী (৮) মানছাবে ইমামত-ফারসী (৯) তানভীরুল আইনাইন-আরবী (১০) মানতেক -এর উপরে একটি পুস্তিকা।-তারাজিম, পৃঃ ৯২ ও ১০৮; জামা'আতে মুজাহিদীন, পৃঃ ১১৭-২৯।

সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈল দু'জনেই দিল্লীর মাদ্রাসা রহীমিয়ার ছাত্র হওয়ার কারণে শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আযীযের লেখনী ও শিক্ষা দ্বারা উভয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রায় সবটুকুই ছিল প্রধানতঃ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্'র লেখনী ও শাহ আব্দুল আযীযের শিক্ষার ফলশ্রুতি। এ সম্পর্কে জনৈক গবেষক যা বলেছেন তা অনেকটা যুক্তিসংগত। 'সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর ধর্মীয় বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে এমন কিছুই ছিলনা, যা শাহ অলিউল্লাহ এবং শাহ আব্দুল আযীয পূর্বেই বলে যাননি। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে শাহ অলিউল্লাহ ও শাহ আব্দুল আযীয ছিলেন অতীব ধর্মপরায়ণ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। যাঁরা কলমের লেখনী ও মুখের বাণীর মাধ্যমে ইসলামের খিদমতের পথ বেছে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সাইয়িদ আহমাদ ছিলেন বাস্তবক্ষেত্রে একজন কর্মীপুরুষ। লেনিন যেরূপ কার্লমার্কসের রচনা ও বাণীকে বাস্তবরূপ দান করেছিলেন, সাইয়িদ ছাহেবও তেমনি শাহ অলিউল্লাহ এবং আবদুল আযীযের মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করে গেলেন।'[৭৯]

দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী মাদরাসা রহীমিয়ার শিক্ষায়তনে ইসলামী ভারতের ভূলুণ্ঠিত ঈমানী নেতৃত্বের ঝাণ্ডাকে পুনরায় উড্ডীন করার কঠিন প্রত্যয় নিয়ে ব্যক্তি তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করেন। একদিকে ক্ষুরধার লেখনী, অন্যদিকে মাদরাসায় বসে ছাত্রদের ঈমানী চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন একদল মর্দে মুজাহিদ যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি করে যান। সেই মুজাহিদ দলের প্রথম কাতারে ছিলেন তাঁর নিজের চারজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। অতঃপর তাঁদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় আল্লামা ইসমাঈল, আল্লামা আব্দুল হাই ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর মত ভবিষ্যত মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ।

জিহাদ আন্দোলনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা কী ছিল, তা কিছুটা আঁচ করা যায় আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদের গবেষণাসমৃদ্ধ অমূল্য রচনা 'মানছাবে ইমামত' ফারসী গ্রন্থটি পাঠ করলে। ইমামতের তাৎপর্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শাহ ছাহেব স্পষ্টভাবে বলেন যে, "সিয়াসাতের তাৎপর্য হ'ল ইমামত ও হুকুমতের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদিগের এমন আইনের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করা, যে আইন তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের জন্য কল্যাণপ্রদ। এখানে মৌলিক নীতি হবে ব্যক্তি বা ব্যাষ্টিস্বার্থে জনগণের শোষণের পরিবর্তে নিঃস্বার্থভাবে তাদের কল্যাণ সাধন।'[৮০]

অতঃপর তিনি রাজনীতিকে সিয়াসাতে ঈমানী ও সিয়াসাতে সুলতানী দু'ভাগে ভাগ করে ব্যক্তিশাসনের পরিবর্তে ঈমানী শাসনের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সেই হারিয়ে যাওয়া ঈমানী শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই ভবিষ্যত ঈমানী রাষ্ট্রের রূপকার আল্লামা শাহ ইসমাঈল ও সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর হাতে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আম্ব, পাঞ্জতার ও পেশোয়ারে তারই সূচনা করেছিলেন তাঁরা নিজেদের হাতেই। তাঁদের এই শুভসূচনা ভবিষ্যতের স্বাধীন ইসলামী আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রথম সূতিকাগ্রহ বৈ কিছুই ছিলনা।

জীবনীকার আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী আলী শাহ ইসমাঈল সম্পর্কে বলেন যে, 'তিনি শাহ অলিউল্লাহ্র খান্দানের পবিত্র বৃক্ষের (شجره طوبى) একটি শাখা, শাহ ছাহেবের খ্যাতনামা পৌত্র, শাহ আব্দুল গণীর পরকালীন নাজাত ও মাগফিরাতের অছীলা-সন্তান, শাহ আব্দুল আযীয, শাহ আব্দুল কাদের ও শাহ রফীউদ্দীনের প্রিয়তম ভাতীজা ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শাগরিদ। শুধু তাই নয়, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি যে কওম ও যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে কওম ও সে দেশের জন্য গর্বের বস্তু হিসাবে গণ্য হন। তিনি ইসলামের সেই সব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রতিভাবান, দুঃসাহসী ও অসাধারণী প্রতিভাবানদের অন্তর্ভুক্ত- শত শত বৎসরেও যাঁদের দু'একজন কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করে থাকেন।'[৮১]

আল্লামা ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮ খৃঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'ভারতবর্ষে এযাবৎ মাত্র একজন মৌলভীর জন্ম দিয়েছে, তিনি হলেন মৌলভী মুহাম্মাদ ইসমাঈল।'[৮২]

প্রসংগতঃ বলা যায় যে, তিনি কেবল শিখ ও ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধেই অবদান রাখেননি। বরং ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার সমূহের বিরুদ্ধেও ঘোষনা করেছিলেন আপোসহীন জিহাদ। আর সেজন্য তিনি সমসাময়িক ওলামা ও রেওয়াজপন্থী মুসলমানদের নিকট দারুনভাবে ধিকৃত হন। এমনকি কুফরী ফৎওয়ারও সম্মুখীন হন। কিন্তু তাঁর এই আপোষহীণ জিহাদী আন্দোলন পরোক্ষভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে তোলে। যে আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রেখে যাওয়া মিশন আজও ভারতবর্ষে কমবেশী চালু আছে।

[বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৪৫-২৪৯]

---

৭৮. গোলাম রসূল মেহের, সাইয়িদ আহমাদ শহীদ (লাহোর : ইছরা, জামে'আ আশরাফিয়া, সালবিহীন), পৃঃ ১১৭-১৮।

৭৯. ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল বারী, 'সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর রাজনীতি' (ঢাকা : মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পৃঃ ৩০, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৬১; গৃহীত : The Morning news (Calcutta, 2nd number, 1944) p. 77.

৮০. প্রাগুক্ত ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পৃঃ ৭৩ (ঈষৎ সংক্ষেপায়িত)।

৮১. আবুল হাসান আলী নদভী, 'সীরাতে সাইয়িদ আহমদ শহীদ' (লাক্ষ্ণৌঃ নামী প্রেস, মার্চ ১৯৩৯) পৃঃ ৩৭৩।

৮২. `India has hitherto produced only one Moulavi and that is Moulavi Mohammad Ismail' - মুহাম্মাদ আব্দুল রহমান, 'মুজাহিদ আন্দোলনের ইতিকথা মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ (ঢাকাঃ ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মে ১৯৭০) পৃঃ ১৬৮ গৃহীতঃ Aspecrs of Shah Ismail Shaheed, p. 44.

মুযাফফরনগর : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লীলাভূমি

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

উপস্থাপনা :

মুসলমান কর্তৃক দীর্ঘদিন স্পেন শাসিত হওয়ার পর সেখানে মুসলিম শাসনের পতন ঘটে। সাথে সাথে মুসলিম জাতিসত্তার অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে দীর্ঘ দিনের মুসলিম শাসনের পতন ঘটলেও এ দেশ থেকে মুসলিম চিরতরে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অথচ স্পেনের চাইতে ভারত থেকে মুসলিম জাতির চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল। স্পেন ভেঙ্গে নতুন কোন দেশ তৈরী না হলেও ভারত ভেঙ্গে শুধু মুসলমানদের জন্য একটি দেশ তৈরী হয়, যা পাকিস্তান নামে পরিচিত। তারপরে আজও ভারতের বিশ কোটি মুসলিম পাকিস্তানী, বাংলাদেশী ইত্যাদি অভিযোগ, হিন্দু কট্টরপন্থীদের হামলা, গুজরাট, আসাম ও মুযাফফরনগর সহ হাযারো দাঙ্গা ও ফাসাদের সাথে লড়াই করে টিকে আছে। এজন্য এই দেশীয় মুসলমানদের সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তাদের ভাষায়, *'হাম ভাগ কার পাকিস্তান নাহি গায়ে, এ মূলক হামারা থা হামারা হ্যাঁয় হামারা রাহেগা'* অর্থাৎ 'আমরা পালিয়ে পাকিস্তান যায়নি; এদেশ আমাদের ছিল, আছে, থাকবে'। আজকের প্রবন্ধে শত বছরের ঐতিহ্য বিজড়িত ভারত ও এদেশীয় মুসলমানদের দুঃখ-সুখ বিশেষ করে মুযাফফরনগরের দাঙ্গা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ভারত পরিচিতি :

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম একটি দেশ ভারত। যাকে ইংরেজীতে ইন্ডিয়া এবং উর্দু ও হিন্দিতে হিন্দুস্তান বলা হয়। তবে হিন্দিতে ভারতও বলা হয়। এ দেশের নামেই দক্ষিণ এশিয়াকে ভারত উপমহাদেশ বলা হয়। অতীতে আফগানিস্তানের গযনী থেকে আরাকান পর্যন্ত এবং কেরালা থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ভারত হিসাবে গণ্য করা হত। আজ এ দেশেরই খণ্ডিত অংশ হিসাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা ও মায়ানমার-এর কিছু অংশ আলাদা আলাদা দেশে পরিণত হয়েছে। ২৮টি প্রদেশ, ৭টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও ৬২২টি যেলা নিয়ে গঠিত পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ এই দেশটি ৩,২৮৭,২৬৩ বর্গ মাইলের এরিয়া নিয়ে গঠিত। সরকারী হিসাব অনুযায়ী শতকরা আশি জন হিন্দু এবং ১৩ জন মুসলমান। কিন্তু মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী এই সংখ্যা আরও বেশী তথা শতকরা ২৫/৩০ জন মুসলমান অর্থাৎ পঁচিশ কোটি মুসলমান এই দেশে বসবাস করে। অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যা হিসাবে ভারত সবার শীর্ষে। প্রদেশ হিসাবে সবচেয়ে বেশী মুসলমান বসবাস করে কাশ্মীরে। তারপর আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, বিহার ও উত্তর প্রদেশে। এ দেশের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে শত জাতের শত ভাষার মানুষ বসবাস করে। এত জাতি, গোত্র ও ভাষার মানুষ মিলে গঠিত দেশের নযীর ভারত ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোথাও নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে সেখানে মোট তেরটি ভাষা চালু রয়েছে।

ভারতের সংবিধান মোট ৪৪৮টি ধারা (Article) নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লিখিত সংবিধান। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারি ভারতের সংবিধান চালু হওয়ার পর থেকে ৩রা জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ৯৮বার সংবিধান সংশোধিত হয়েছে। সংবিধানে ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সংবিধানে ভারতকে বলা হয়েছে, রাজ্য সমূহের সমষ্টি বা রাজ্যসংঘ (Union of States)। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন কাঠামো অনুসারে কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যে রাজ্য সরকার গঠিত হয়। ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অঙ্গ রাজ্যগুলোর শাসনভার সেখানকার নির্বাচিত সরকারের ওপর ন্যস্ত। ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে সংবিধানে তিনটি তালিকা আছে। যথা : (ক) কেন্দ্রীয় তালিকা (খ) রাজ্য তালিকা ও (গ) যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো কতকগুলো বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে ও আইন প্রণয়ন করে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়, মুদ্রা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ৯৭টি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আছে। একে কেন্দ্রীয় তালিকা বলে। রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রভৃতি মোট ৬৬টি বিষয়ের ভার দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলোর উপর, একে রাজ্য তালিকা বলে। এছাড়া বিচারব্যবস্থা, সংবাদপত্র, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সেচ প্রভৃতি ৪৭টি বিষয়ে যুগপৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলো আইন প্রণয়ন করতে পারে, একে যুগ্ম তালিকা বলে। ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও দেশের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতে থাকে। যাতে দেশের ঐক্য ও সংহতি কোনো রূপেই বিঘ্নিত না হয়। একারণে সংবিধান রচয়িতাগণ কেন্দ্রের হাতে অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান হলেও ভারতীয় সংবিধানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা চালু আছে। ভারতের মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নিযুক্ত হয়। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান। রাজ্যগুলোতেও এই প্রথা চালু আছে।

এটা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করতঃ পৃথিবীর বুকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হয়। স্বাধীনতার সময় ভারত বর্ষে দু'টি মতবাদ প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। **১.** দ্বিজাতি তত্ত্ব বা ধর্মের উপর ভিত্তি করে আলাদা দেশ গঠন। এর অধীনে একদল মুসলিম ছিলেন, যারা নিজেরা আলাদা দেশ চাইতেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ও তার দল মুসলিম লীগ। অন্যদিকে একদল হিন্দু ছিল, যারা এই দেশ থেকে মুসলিমদের তাড়িয়ে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতে চাইত। তখন এই গ্রুপটির সাংগঠনিকভাবে কোন অস্তিত্ব না থাকলেও পরবর্তীতে এরা এস এস, শিব সেনা, বাজরাং দল, বিজেপি নামে অস্তিত্ব লাভ করে এবং আজও তারা *ইয়া তো পাকিস্তান যা ইয়া কবরস্থান যা* অর্থাৎ 'হয় পাকিস্তানে যা না হয় গোরস্থানে যা' এই শ্লোগান নিয়ে মুসলিমদের উপর অন্যায় ও অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে যাচ্ছে। **২.** অন্য একটি মতবাদ ছিল সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ, যারা 'অখণ্ড ভারত'-এর দাবী নিয়ে দেশ ভাগের বিরোধিতা করেছিল। এই গ্রুপে হিন্দু মুসলিম উভয়ে ছিল। মুসলিমদের মধ্যে থেকে

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও হোসাইন আহমাদ মাদানী এবং হিন্দুদের পক্ষ থেকে মোহন চাঁদ ও করম চাঁদ গান্ধী। এরাই ভারতে কংগ্রেস পার্টি নামে পরিচিত। নেহরু ও গান্ধী পরিবারের সদস্যগণ এই সংগঠনের ধারক ও বাহক। ভারতের মুসলিমরা এই দুই দলের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। তারা বিজেপিকে ভোট দিতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে মন্দের ভাল হিসাবে কংগ্রেসকে ভোট দেয়। কিন্তু তারা মুসলিমদের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সব সময় মুসলিমদেরকে নিজেদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করছে। এবার কিছু দিন হ'ল 'আম আদমী পার্টি' নামে একসময়ের আন্না হাজারের সহযোগী রাজনীতির মাঠে এলাহী কারবার করে ফেলেন। অনেকেই বিশেষ করে মুসলমানরা আবেগের বশবর্তী হয়ে তার দলে যোগ দিচ্ছে, কিন্তু তার সম্পর্কে এখনই কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

মুযাফফরনগর দাঙ্গা :

মুযাফফরনগর উত্তর প্রদেশের একটি অন্যতম যেলা, যার উত্তরে সাহারানপুর এবং দক্ষিণে মীরাঠ। মুযাফফরনগর থেকে 'দিল্লি এক্সপ্রেস' ট্রেনে দুই ঘণ্টার রাস্তা। উত্তর প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তের মুযাফফরনগর সহ অন্যান্য যেলা শুগার বেল্ট বা চিনি কলের শিল্পাঞ্চল হিসাবে পরিচিত। শুধু মুযাফফরনগর যেলাতেই ১১টি চিনিকল আছে। উত্তর প্রদেশে যে দলের সরকার থাকে কেন্দ্র সরকারের উপর তাদের অনেকটা প্রভাব থাকে। কেননা রাজধানী দিল্লি উত্তর প্রদেশের মধ্যে, যদিও দিল্লিতে আলাদা সরকার গঠিত হয়। বর্তমান উত্তর প্রদেশে ক্ষমতায় আছে 'সমাজবাদী পার্টি', যার নেতা হচ্ছে ইয়াদো (যাদব) পরিবার। সমাজবাদী পার্টির এই সরকার মুসলমানদের প্রতি দয়ার্দ্র বলে পরিচিতি ছিল এবং এই কারণেই মুসলমানরা তাকে বিপুল পরিমাণ ভোট দিয়ে মায়াবতীর সরকারকে হটিয়ে তাদেরকে ক্ষমতায় বসায়। কিন্তু তারা মুসলমানদের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে গত আগস্ট মাসে হয়ে যাওয়া মুযাফফরনগর দাঙ্গা তাদেরকে হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় মোদি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

দাঙ্গার পিছনের কারণ হিসাবে বিভিন্ন পত্রিকাতে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হল, ২৭ আগস্টে কিয়াল গ্রামের একজন যুবক জাঠ সম্প্রদায়ের এক তরুণীকে ইভটিজিং করে। ফলে ঐ তরুণীর চাচাত ভাই ও বন্ধুর সাথে এই ছেলের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নিলে মেয়েটি নিহত হয়। কাকতালীয়ভাবে ছেলেটি ছিল মুসলিম। এরপর নিহতের গ্রামের লোকজন হত্যাকারী জাঠকে হত্যা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয়। কিন্তু দাঙ্গাটি মূলতঃ পরিকল্পিত ছিল। কারণ দাঙ্গার আগে থেকেই সাহারানপুর, মুযাফফরনগর, মীরাঠ ইত্যাদি জায়গায় ট্রেনে মাদরাসার ছাত্রদের বিভিন্ন দিনে হিন্দু কট্টরপন্থীরা প্রহার করে। ফলতঃ এই অঞ্চলগুলোতে আগে থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল। দাঙ্গার আগের দিন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের জন্য আমার মযাফফরনগর যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। আমি যেদিন যাই, সেদিনের অবস্থা অনেক উত্তেজিত ছিল। অথচ তখনও উপরে উল্লেখিত ঘটনা ঘটেনি। উত্তেজনার কারণ ছিল, আগের দিন দিল্লি থেকে মুযাফফরনগর হয়ে সাহারানপুর আসার পথে একজন মাদরাসার ছাত্রকে হিন্দুরা ট্রেনের মধ্যে ব্যাপকহারে প্রহার করে। সে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে কোনও মতে নিজের প্রাণ বাঁচায়। এছাড়া উপরে উল্লেখিত ঘটনার সাথে সাথে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়নি। বরং উক্ত ঘটনাকে সামনে রেখে কিছু হিন্দু কট্টরপন্থী নেতার উত্তেজনা মূলক অডিও/ভিডিও বক্তব্য হিন্দু তরুণদের মাঝে অজ্ঞাত কারো মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ফলে তারা উত্তেজিত হয়ে মুসলমানদের প্রতি হামলা করে। অতঃপর দেখতে দেখতেই এই দাঙ্গা মুযাফফরনগর থেকে আগুনের মত আশেপাশের দুই তিন যেলায় প্রসারিত হয়। দাঙ্গার আতংকে ভীতিকর অবস্থার মধ্যে থাকার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে কোনদিন হয়নি। এটা সত্যিই আশ্চর্য এবং দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। যে শহর ও বাজারকে আগের দিন পর্যন্ত গভীর রাতেও মানুষের হাসি-আনন্দে গম গম করতে দেখতাম, আজ সেই একই বাজারে মাগরিব হতেই একটা পোকার আওয়াজও পাওয়া যায় না; যে রাস্তায় দিনে রাতে নির্ভয়ে চলতাম, সেই রাস্তায় আজ আর চলার সাহস হয় না; যে রুমের জানালা গরমের কারণে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত খুলে রাখতাম, সেই জানালা সন্ধ্যা হতেই বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বাসার মালিকের ভয়ার্ত ঘোষণা; যে বন্ধুদের মাদরাসার বাইরের মসজিদগুলোতে ইমামতি ও মুয়ায্যিনী করতে দেখতাম, তাদেরকে মাদরাসায় রাত্রি যাপন করতে দেখলাম; জিজ্ঞেস করলে জানায় মুতাওয়াল্লী দাঙ্গার আশঙ্কায় মসজিদে থাকতে নিষেধ করেছেন। এমনকি পরিস্থিতি এ পর্যন্ত গড়াল যে, হিন্দু কট্টরপন্থীরা নাকি সরাসরি মাদরাসাতেই আক্রমণ করবে। পরিস্থিতির আলোকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মাদরাসার বাইরে যাওয়া নিষেধ করে দিল। এমনকি কুরাবানীর ছুটিতে মাদরাসার ছাত্ররা কিভাবে বাড়ীতে যাবে এই আশঙ্কায় দিনাতিপাত করছে। কেননা বের হলেই রাস্তা-ঘাটে হিন্দুদের আক্রমণের ভয়। এই আশঙ্কায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ কুরবানীতে ছুটি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অথচ মাদ্রাসাটি ছিল দারুল উলূম দেওবন্দ, যার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা হিন্দুরা কোনদিন এখানে আক্রমণ করেনি এবং করার সাহসও কোনদিন করবে না। কেননা সরকারের সাথে তাদের আগে থেকেই ভাল সম্পর্ক। প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কারণে দাঙ্গার প্রভাবে দেওবন্দের দুই-তিন জায়গায় হিন্দুরা মুসলিম যুবকদের গুলি করে হত্যা করলেও মদারাসা পর্যন্ত তা গড়ায়নি।

সত্যিই এটি ছিল নতুন পরিবেশে নতুন অভিজ্ঞতা। চারিদিকে শুধু ভীতি আর ত্রাস। ভাবতাম, যাকে কোনদিন দেখিনি, যার সাথে আমার কোনও সম্পর্ক নেই, কোনও লেনদেন নেই, গণ্ডগোল নেই। অথচ সে আমাকে সুযোগ পেলেই হত্যা করবে শুধু এই জন্য যে, আমি একজন মুসলিম। সত্যিই দুঃখজনক। এটাই নাকি আবার সেক্যুলার রাষ্ট্র! যারা একজন নিরীহ মুসলিমের জীবনের নিরাপত্তা দিতে পারে না, তারা সেক্যুলার কেমনে হয়! এই সেক্যুলারিজমকে ধিক্কার জানাই! দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, এই ভারতকে ইসলাম ৭৫০ বছর শাসন করছে। এই ঘৃণ্য চিত্র সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটা গুজরাট, একটা আসাম বা মুযাফফরনগর নেই। নেই মুসলিমদের আক্রমণে নিরস্ত্র নিরীহ হিন্দুদের রক্তের স্রোত। নেই হিন্দু নারীর আহাজারি, অবুঝ শিশুর আর্তচীৎকার, বরং আছে ঠিক এর উল্টা। আর সেক্যুলারিজম মাত্র ষাট বছরে ছোট বড় সব মিলিয়ে তেইশ হাযারেরও বেশী দাঙ্গার জন্ম দিয়েছে। বাবরী মসজিদকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেছে। গুজরাট, আসাম ও মুযাফফরনগরে হাযার হাযার মা-বোনের ইয্যত লুটেছে। এটা যদি সেক্যুলারিজম হয়, তাহলে এই সেক্যুলারিজমকে ধিক শত ধিক!!

পরে ধীরেধীরে পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম, প্রায় ষাট জনের মত মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে এবং পঞ্চাশ হাযারের মত মানুষ তাদের ঘর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে এবং কত মা-বোনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ কোন্ মাদরাসায় আশ্রয় নিয়েছে, কেউ মাঠের মধ্যে তাঁবু টানিয়ে দিনাতিপাত করছে, কেউ বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে চলে গেছে। শিবিরে আশ্রয় নেয়ার পর সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে ৮৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরী মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন তাদের বাবা-মা। এর মধ্যেই উপস্থিত হল শীত। এখান থেকে হিমালয় পর্বত নিকটে হওয়ায় শীত বেশি পড়ে। এই কনকনে ঠাণ্ডা শীতেও সরকার মুসলমানদের ঘরে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেনি। এমনকি উল্টা প্রায় ৪২০ টি পরিবারকে তাঁবু থেকে উচ্ছেদ করে দেয় এবং বুল্ডোজার দিয়ে তাদের তাঁবুকে গুঁড়িয়ে দেয় *(দৈনিক ইনকিলাব, উর্দু, ১/১/২০১৪, পৃষ্ঠা : ১)*।

এই দিকে মুসলমানদের এই দুঃখ-দুর্দশার মাঝে কাঁটা ঘায়ে নূনের ছিটা দেয়ার মত আঘাত করে কংগ্রেসের তরুণ লিডার রাহুল গান্ধী বলেন, যারা আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে, তারা আই. এস. আই. এবং লস্করে তৈয়্যেবার সাথে জড়িত *(দৈনিক ইনকিলাব, উর্দু, ১৬/১/২০১৪ পৃঃ ৭)*। অন্য দিকে সমাজবাদী পার্টির লিডার মুলায়িম সিং ইয়াদো (যাদব) বলেন, যারা আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে তারা বিজেপি ও কংগ্রেসের এজেন্ট *(প্রাগুক্ত)*। তাদের এই মন্তব্য সত্যিই দুঃখজনক। এছাড়া এই অবস্থার মধ্যেই যেখানে মুযাফফরনগরে মুসলিম নারী শিশু না খেয়ে এবং শীতের প্রকোপে মারা যাচ্ছে, সেখানে মুযাফফরনগর থেকে অনতিদূরে সাইফাইতে সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে একটি কনসার্টের আয়োজন করা হয়, যেখানে বলিউডের নামীদামী নায়ক-নায়িকারা আসেন এবং প্রায় কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হয়। সেই দিনের দৃশ্য সত্যিই আশ্চর্যজনক ও মানবতাবিরোধী।

সুধী পাঠক! এই হল সমাজবাদী পার্টি ও মুলায়িম সিং ইয়াদোর আসল চেহারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সান্ত্বনার মত বলতে যা আছে, তা হচ্ছে ১৮শ' ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৫ লাখ রূপি করে ক্ষতিপূরণ প্রদান। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা যেখানে এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশী, সেখানে এই টাকা দিয়ে কী হবে?

ইসলামী দলগুলোর কার্যক্রম :

বিভিন্ন ফাসাদ বা দাঙ্গার পরেই হিন্দুস্তানের ইসলামী দলগুলো মুসলিমদের সেবায় মাঠে নেমে আসে। নিম্নে সাংগঠনিক পরিচয় সহ তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল :

জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দ : এ সংগঠনটি ভারতে মুসলমানদের অধিকার আদায়ের নিমিত্তে ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হ'ল যে, বর্তমানে এই দলটি একটি নির্দিষ্ট মাসলাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়েছে। ২০০৮ সালে 'জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এ আয়োজনে দেওবান্দে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক বিশ্ব সম্মেলন আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রায় ৫ হাযার আলেম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলনের কিছুদিন পরেই আরশাদ মাদানী, যিনি হোসাইন আহমাদ মাদানীর ছেলে ও মাহমুদ মাদানী, যিনি হোসাইন আহমাদ মাদানীর পৌত্র আলাদা হয়ে যান। উভয়ে নিজেকে আসল 'জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর উত্তরসূরী মনে করতে থাকেন এবং অদ্যাবধি উভয়ে আলাদা আলাদা জমীয়ত চালাচ্ছেন। ফলতঃ ভারতে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্তি একটি পারিবারিক কোন্দলে আজ দু'ভাগে বিভক্ত, যা ভারতের মুসলমানদের সীমাহীন ক্ষতি করেছে এবং এখনো করে চলেছে এবং দিন দিন উভয় জমীয়তের মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে।

মুযাফফরনগর ফাসাদে উভয় জমঈয়তই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অর্থ, শীতবস্ত্র ও ফ্ল্যাট বাড়ী দিয়ে সহযোগিতা করে, যা বিভিন্ন পত্রিকায় বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দুস্তানের মুসলমানরা বহুদিন থেকে 'ইন্সিদাদে ফিরাকা ওয়ারানা ফাসাদাত বিল' বা মাঝারী দাঙ্গা দমন বিল' ভারতের সংসদে পাশ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সফল হয়নি। অনেকের ধারণা জমঈয়ত যদি এক থাকত, তাহলে কেন্দ্র সরকার এই বিল পাশ করতে বাধ্য হত। এরপরেও বিভিন্ন দিক থেকে চাপের মুখে পড়ে ও ভোট ব্যাংক হাছিলের উদ্দেশ্যে সোনিয়া গান্ধী আগামী অধিবেশনে এই বিল সংসদে পেশ করার আশ্বাস দিয়েছেন। এই বিল যদি পাশ হয়, তাহলে এই জাতীয় দাঙ্গা অনেকটা হলেও কমে যাবে এবং মুসলমানদের জন্য আইনী লড়াই করা সুবিধা জনক হবে। তবে পাশ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। কেননা সোনিয়া গান্ধীর সৎ নিয়ত থাকলে তিনি লোকপাল বিলের জায়গায় এই বিল নিয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি ওয়াদা দিয়েও গত অধিবেশনে এই বিল না নিয়ে এসে লোকপাল বিল পাশ করান। অথচ বর্তমান হিন্দুস্তানের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে দাঙ্গা।

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ :

ভারতের সবচেয়ে পুরাতন ইসলামী সংগঠন হচ্ছে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ। যার পূর্ব নাম অল-ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স, যা ১৯০৬ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংগঠনটি খাছ দ্বীনি খেদমতের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তা মাসলাক, মাযহাব নির্বিশেষ মুসলমানদের খেদমতে সর্বদা অবদান রেখেছে। বর্তমান মুযাফফরনগরে ফাসাদ হওয়ার পর মোট তিনবার জমঈয়তের প্রতিনিধি দল অত্র এলাকা পরিদর্শন করে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। গত ২৯ সেপ্টেম্বরে যে প্রতিনিধি দল সফর করে, তার মধ্যে সভাপতি আল্লামা আছগর আলী উপস্থিত ছিলেন *(তরজুমান, অক্টোবর)*। এছাড়া জামায়াতে ইসলামী হিন্দ সহ অনেক সংগঠন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

ভারতের মুসলমানদের এই অবস্থার কারণ :

১. দ্বিজাতি তত্ত্ব : আমাদের কাছে দ্বিজাতি তত্ত্ব আশির্বাদ হলেও ভারতীয় মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটা তাদের জন্য অভিশাপ। তাদের মতে আজ যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রায় ষাট কোটি মুসলমান তাদের সাথে থাকত, তাহলে ভারত বর্ষের ত্রিশ কোটি মিলে মোট নব্বই কোটি এবং শতকরা ৫৫/৬০ মুসলমান এই দেশে বসবাস করত। তাহলে মুসলমানরা এই দেশে সংখ্যা লঘু হত না, বরং বলা চলে সংখ্যা গরিষ্ঠই হত এবং ভারত বিভক্তির ফলে তারা যেভাবে কমজোর হয়ে পড়েছে, সেই রকম কমজোর হত না। কেননা পাকিস্তান তৈরির ফলে তারা তাদের জনসংখ্যা যেমন হারিয়েছে, তেমনি অনেক প্রতিভাবান মেধা ও নেতৃত্ব হারিয়েছে এবং ভারত বিভক্তি তাদের উপর ক্বিয়ামত হিসাবে অবতীর্ণ হয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার ১৯৪৮ সালে দিল্লির শাহী জামে মসজিদে এক 'ফুড ফর থিংক' ভাষণ দেন, যার অডিও রেকর্ড আমার কাছে রয়েছে। তার কথার সারমর্ম হচ্ছে, পুরা পৃথিবী আল্লাহ্র মসজিদ, তাকে পাক

ও নাপাকের মধ্যে পার্থক্য করা শরী'আত বিরোধী, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ভারতে হাযার বছর থেকে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে একদিনের মধ্যেই নিজেকে নিজ দেশে পরদেশী করে দেয়, বরাবর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানকে একদিনেই সংখ্যা লঘুতে পরিণত করে দেয়।

এই দিকে ভারত বিভক্তির ফলে ভারতীয় মুসলমানদের যা ক্ষতি হওয়ার তাতো হয়েছেই, সাথে আহলেহাদীছদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আহলেহাদীছ-এর শিক্ষা কেন্দ্র 'জামিয়া রহমানিয়া দিল্লি'-এর মুহতামিম পাকিস্তান চলে যাওয়ায় জামেয়া রহমানিয়া বন্ধ হয়ে যায় সেই সাথে মাদরাসার অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ লাইব্রেরী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ধ্বংস হয়ে যায়, যার কিছু ধ্বংসাবশেষ এখন দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ভার্সিটির লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এই মাদরাসা বন্ধ হওয়ার পর থেকে 'জামিয়া সালাফিয়া' প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে আহলেহাদীছদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। অন্যদিকে জমঈয়তে আহলেহাদীছের সেক্রেটারী জেনারেল, দুনিয়ার বুকে খতমে নবুওয়াতের এক অনন্য মু'জেযা, কাদিয়ানিরা যার নাম শুনলে আজও কাঁপে সেই ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর মূল্যবান লাইব্রেরী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় ধ্বংস হয়ে যায়। তিনি রাতের অন্ধকারে নিজের জান নিয়ে পাকিস্তান চলে যান। তার লাইব্রেরীকে রক্ষা করার জন্য মাওলনা আবুল কালাম আযাদ দিল্লি থেকে একদল পুলিশ পাঠালেও তারা পৌঁছার আগেই শিখরা তা জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। মাওলানাকে তার লাইব্রেরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিল। এই কারণেই তার বিখ্যাত 'আখবারে আহলেহাদীছ' পত্রিকা অনেক দিন যাবৎ বন্ধ থাকে।

অন্যদিকে দ্বিজাতি তত্ত্ব ভারত বর্ষের আলেম-ওলামাদের মাঝে কঠিন মতপার্থক্য তৈরী করে। আহলেহাদীছদের মধ্যে মাওলানা সাইফ বানারাসী ও আবুল কালাম আযাদ কংগ্রেসের সাথে থেকে ভারত বিভক্তির বিরোধিতা করেন এবং ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি, আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী ও মাওলানা আকরাম খাঁ মুসলিম লীগের সাথে থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অনন্য অবদান রাখেন। এদিকে দেওবন্দী আলেমদের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও সাব্বির আহমাদ ওছমানী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে থাকেন, অন্যদিকে মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী ও তার অনুসারীরা ভারত বিভক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান করেন। এভাবে তখন ভারতের আলেম সমাজ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভারতের মুসলমানরা এক প্রকার নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে তারা তাদের অনেক দুর্লভ প্রতিভাকে পাকিস্তানের কাছে হারিয়ে বসে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের মুসলমানরা আর কোনো পাঞ্জেরী বা পথের দিশারী খুঁজে পাইনি।

উল্লেখ্য যে, অনেকেই মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে আহলেহাদীছ মনে করেন না। বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষীরা এবং ভারতের আহলেহাদীছরা তাকে নিজেদের গর্বিত ইতিহাসের অংশ মনে করে। মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী-এর উর্দূ তরজমাকৃত ইলামুল মুয়াক্কিঈন-এর ভুমিকা তারই লেখা, যা পড়লে প্রত্যেক মানুষের ভুল ধারণা ভাঙতে বাধ্য এবং মিয়াঁ নাযির হোসাইন দেহলভীর লিখিত 'মিয়াঁরে হক' সম্পর্কে তার উচ্চ প্রশংসা ও তার আহলেহাদীছ হওয়ার বড় প্রমাণ বহন করে।

২. অশিক্ষা : ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে মুসলিম সমাজ। আমি একদিন দুধ কিনতে গেলে এক ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করে, *'মাওলানা যারা কালেমা শিখা দো'*। উল্লেখ্য, খানে মাদরাসার ছাত্রদের মাওলানা বলা হয়। আমি তো হতবাক ত্রিশ চল্লিশ বছরের একজন মুসলিম কালেমাও জানে না! এই ধরণের মুসলিম বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। কিন্তু এখানে অহরহ এ ধরণের মুসলিম পাওয়া যাবে। শুধু ইসলামী শিক্ষা নয়, দুনিয়বী শিক্ষা থেকেও মুসলিমরা অনেক অনেক পিছিয়ে। মুম্বাই, দিল্লি, কলকাতা সহ বিভিন্ন বড় শহরে যাদেরকে সড়কে রিকশা চালাতে, হোটেলে কাজ করতে, মানুষের বাড়ীতে কাজ করতে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই মুসলমান এবং অনেকের কাজের বয়সই হয়নি। রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে একজন শিখ ভিক্ষুক দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মুসলমনদের দেখলে মনে হবে সব মুসলমানই হয়তোবা শুধু ভিক্ষা করে। এই দেশে মুসলিমদের শিক্ষার জন্য মাত্র ৪ টি সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। যেগুলো হল আলীগড়, জামিয়া মিল্লিয়া, মাওলানা আযাদ ন্যাশনাল উর্দূ ও মাওলানা জওহর আলী ভার্সিটি, যা মুসলমানদের সংখ্যার তুলনায় একদম কম। এই জন্য মুসলিম নেতাদের উচিৎ সামনে এগিয়ে আসা। গত কয়েকদিন আগে কিশানগঞ্জে মাওলানা আসরারুল হক কাসেমীর প্রচেষ্টায় মুসলমানরা মাযহাব-মাসলাক ভুলে যেভাবে আলীগড় ভার্সিটির শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে এবং সফল হয় তা ভারতীয় আলেম সমাজ ও মুসলিম নেতাদের জন্য শিক্ষণীয়। আজও যে মুসলমানরা এক থাকলে সফল হবে এটা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

৩. নিজের আদর্শ হারিয়ে ফেলা : আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনও জাতির সাথে চলে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব আদর্শ ধরে রাখা যে কত কঠিন তা ভারতের মুসলমানদের দেখলে বুঝা যাবে। এই দেশের অনেক মুসলমান শুধু নামেই মুসলমান আছে। তারা সব ক্ষেত্রে হিন্দু ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণ শুরু করেছে। যেমন আমাদের দেশে বিবাহে গান-বাজনা হলেও যখন বউকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার পিছনে ঢাক-ঢোল নিয়ে তরুণ-তরুণী মিলে হাঁটতে হাটতে নাঁচতে নাঁচতে যাওয়া হয় না। মূলতঃ এটা হিন্দুদের আদর্শ। কিন্তু মুসলমানরাও এখন বিনা দ্বিধায় তা করছে। আমদের দেশে মেয়েদের সাইকেল চালানো সামাজিকভাবে দৃষ্টিকটু, কিন্তু এখানে হিন্দুদের মত মুসলিম মেয়েরাও আমভাবে সাইকেল, মোটর সাইকেল সব চালাচ্ছে। আমার তো মনে হয় রাস্তা-ঘাটে যারা বিড়ি সিগারেট, তামাক খায় তাদের অধিকাংশই মুসলমান। এই রকম কত শত আদর্শ আছে, যা অনেক মুসলমান জানেই না।

৪. শিরক-বিদ'আত : ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান ব্রেলভী বা কবর পূজারী। দেওবান্দীরা আদর্শিকভাবে কবর পূজারী না হলেও তাদের 'আম জনতা ও ব্রেলভীদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। এটা তাদের শিরক-বিদ'আতের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শনের ফল। একমাত্র মুহাদ্দিছদের আন্দোলনের ফলে যারা শিরক-বিদ'আত থেকে মুক্ত হয়েছে বা হচ্ছে তারাই এ থেকে বেঁচে আছে। তাদের সংখ্যা অন্য মুসলমানদের তুলনায় অনেক কম। তবে আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর সব দেশের মত ভারতেও এই আন্দোলনের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সেই ঐতিহাসিক উক্তি : *'যিস মুল্ক মেঁ রাসূল (ছাঃ) কে হাদীছ পার দুসরে ইমাম কে কাউল কো তারজীহ দি জাতী হে, উস্মে কাব তাক ইসলাম বাকী রাহেগা'* অর্থাৎ যে দেশে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের উপর অন্য ইমামের কথাকে প্রাধান্য দেয়া হয় সেখানে কতদিন ইসলাম বাকী থাকবে?' মুহতারামের কথা সত্যে পরিণত হয়েছে আজকে এই মুল্কে, সেখানে ইসলাম বাকী থাকেনি বরং মুসলমানরা গোলামে পরিণত হয়েছে। তাইতো দেখি ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার পৌত্র এ দেশে হাদীছের উপর আমলের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তারা জানতেন কেবল এই পথেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আফসোস! কবে এই হাদীছ বিরোধী ও গণতন্ত্র পন্থীদের বোধোদয় হবে!

৫. অনৈক্য : বানারাস ডালমণ্ডি (কাপড়ের আড়ৎ) থেকে গেলাম জালালীপুরা। একটা রুম খুঁজছি, সাথে বাথরুম থাকবে। এক মহল্লায় গেলাম। অনেককে খোঁজাখুজির একপর্যায়ে এক ভাই আশ্বাস দিল পাওয়া যাবে। কিন্তু হটাৎ করে কী যে হল, ভাইটা আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন মাযহাবের? ব্রেলভী? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, *ইস্কা মাতলাব তুম ওহাবি হো, জলদী এহা সে ভাগো, অরনাহ তুম পে বাজেগা। তুমহে পাতা নাহি এ সুন্নিও কা হে?* আমি তো হতবাক। এখানে শুধু হিন্দু-মুসলিম আলাদা মহল্লা নয়। মাযহাবের উপর ভিত্তি করে আলাদা মহল্লা হয়ে গেছে। বিশ্বাস না হলে এটাই বাস্তবতা শী'আ-সুন্নী আলাদা আলাদা মহল্লা অনেক আগে থেকেই, কিন্তু এখন অন্য মাযহাবের উপর ভিত্তি করেও আলাদা আলাদা মহল্লা দেখা যায়। ভারতের মুসলমানদের এই অবস্থার সবচেয়ে বড় কারণ হল, অনৈক্য ও দলে দলে বিভক্ত হওয়া। এর জন্য মুসলিম নেতাদের আমিত্ব ও নিজের যাত বা সত্ত্বাকে মাটির সাথে মিশিয়ে সামনে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের অবস্থা কতটা আশংকাজনক হতে পারে তা কল্পনার বাইরে।

৬. নীচতা হীনতা : আসলে যখন কোনও পরিবার, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের শান-শৌকত খুব উঁচু পর্যায়ে থাকে, তখন তাদের এই পদমর্যাদা তাদের মাঝে একটা আত্মমর্যাদা সৃষ্টি করে, যা তাদের হৃদয়কে বড় করে এবং আত্মমর্যাদায় আঘাত এলে আহত বাঘের মত হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক এর বিপরীতে কোনও কওম যখন নিজের ঐশ্বর্য হারিয়ে ফেলে তখন কওমের লোকেদের উপর এর প্রভাব পড়ে। যা হয়েছে মুসলমানদের। লাখ লাখ মা-বোনের ধর্ষিতা চেহারা, গগণবিদারী আর্তচীৎকার এদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানা তো অনেক দূরের কথা বরং জমীয়তে উলামায়ে হিন্দের আমীর আরশাদ মাদানীর বলা তথ্য অনুযায়ী হিন্দুস্থানের জেলের শতকরা আশি জন মুসলমান নিজের মুসলিম ভাইয়ের সাথেই মারামারি-গণ্ডগোলের অভিযোগে জেল খাটছে।

সমাধান :

সিংহ শার্দূল মুহাম্মাদ বিন কাসিমের হাত ধরে এই দেশে ইসলামের প্রকাশ্য যাত্রা থেকে শুরু করে ইংরেজদের জাহাজ নোঙ্গর ফেলার আগ পর্যন্ত মুসলমানরা এই দেশে অত্যন্ত আব ও তাব এর সাথে শাসন চালিয়ে এসেছে। দিল্লির জামে মসজিদ, লালকেল্লা, কুতুব মিনার, আগ্রার তাজমহল আজও সেই শানদার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শাহী জামে মসজিদ আজও সেই রকম থাকলেও তার মুহাফিয ও মুছল্লী সেরকম নেই। কুতুব মিনার থাকলেও কুতুবুদ্দিন আইবেকের উত্তরসূরীরা অসহায় ও নির্লিপ্ত। কোন এক অজানা ঝড়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। একদিনের রাজা আজ প্রজা। এক দিনের বাদশাহ আজ গোলামে পরিণত হয়েছে। একদিনের মালিক মামলুক হয়ে গেছে।

গুজরাট, আসাম ও মুযাফফরনগর সহ হাযারও দাঙ্গার অসহায় শিকার মুসলিম মা-বোনের আহাজারী, সন্ত্রাসের অভিযোগে জেলের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী হাযারও মুসলিম তরুণের নিভৃত কান্না আজ দিল্লির লালকেল্লা ও শাহী জামে মসজিদে গুমরে মরছে। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিথ্যা আশ্বাস ও ওয়াদার রঙ্গিন ফাঁদের বুলি হচ্ছে এই অসহায় মুসলিম জনতা। অথচ এই দেশের স্বাধীনতায় মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য।

শাহ ইসমাইল শহীদ, সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী, বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ইংরেজ বিরোধী জিহাদের অনন্য, অপরাজেয় সিপাহীসালার ছিলেন। তাদের লড়াই ছিল স্বাধীন মুসলিম ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য। অবশ্য ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ এই তিন দেশের মুসলমানগণই নিজ নিজ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ণের পিছনে তাঁদের অবদানকে স্বীকার করেন এবং মনে করেন তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের রক্তে এই দেশের মাটিকে রঞ্জিত করেছেন তা সফল হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হ'ল ইংরেজরা যখন ভারতে আসে তখন এই দেশ ছিল মুসলমানদের। অতএব তারা যখন চলে যাবে তখনো এই দেশ থাকবে মুসলমানদেরই হাতে, যা হবে তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। কিন্তু খ্রীস্টান ইংরেজদের হাত থেকে মুশরিক হিন্দুদের হাতে ভারত চলে যাওয়াকে এবং ভারত মুসলমানদের হাতে না আসার ব্যর্থতাকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢেকে দেওয়াকে কিভাবে তাদের প্রচেষ্টার ফল বলা হয়? তবে এতটুকু বলা যায়, তাদের ইসলাম প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অন্যতম প্রতিপক্ষকে এই দেশ থেকে বিতাড়নের সফলতা তাদের চেষ্টার ফল কিন্তু স্বপ্নের বাস্তবায়ন নয়। অন্যদিকে যারা ইসলামের নামে শাহ ইসমাইলের প্রচেষ্টাকে নিজেদের ঘরের পুঁজি ও ইতিহাস বানানোর চেষ্টা করেন তাদের সাথে তার কোনও দূরতম সম্পর্কও ছিল না। তাদের শিরক বিদ'আতযুক্ত ইসলামকে শাহ ছাহেব ঘৃণা করতেন। তার লেখা 'তাযকীরুল ইখওয়ান' বইয়ের *'তাক্বলীদ ভী এক বিদ'আত হ্যাঁয়'* অধ্যায়ে তিনি তাক্বলীদে শাখছীকে খর্ব করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন শিরক-বিদ'আতমুক্ত ভারত গড়তে। তার এই চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষের মুসলমানদের সকল সমস্যার সমাধান। অনেক মুসলিম নেতা সেক্যুলারিজম বা মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি থাকাকে একমাত্র সমাধান হিসাবে দেখেন। এটা তাদের দূরদৃষ্টির অভাব। এতে আংশিক সমস্যার সমাধান হলেও পূর্ণ সমস্যার সমাধান কোন দিনও হবে না। যতদিন না মুসলমানরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে শিরক-বিদ'আত থেকে মুক্ত হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে জমা না হবে, ততদিন তারা এই চক্র থেকে বের হতে পারবে না। আর এটাই ছিল আমাদের পূর্বসূরী মুজাহিদে মিল্লাতদের স্বপ্ন। তাই ভারতের মুসলমানদের প্রতি এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদাত্ত আহব্বান জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন! আমীন!!

[লেখক : শেষ বর্ষ, দাওরায়ে হাদীছ বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ, সাহারানপুর, উত্তর প্রদেশ, ইণ্ডিয়া]

পবিত্র ক্বাবা যখন যুদ্ধক্ষেত্র

-মিনহাজ আল-হেলাল

ঘটনার সূত্রপাত :

তখনও অন্ধকার ছাপিয়ে শুরু হয়নি আলোর ঝলকানি। একটি সাধারণ দিনের ন্যায় সেদিনের পূর্ব গগন লাল বর্ণের রক্তিম আভায় বর্ণিল। অন্যদিনের মতই ফজরের ছালাত আদায় করতে হাযার হাযার মুছল্লীর আগমন ঘটেছিল পবিত্র হারামে শরীফে। অন্য প্রভাতগুলোর মতই একটা স্বাভাবিক প্রভাত প্রত্যাশা ছিল সকলের। হজ্জের মৌসুম। ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর। তখনও সবার অজানা ছিল এই দিনেই রচিত হতে যাচ্ছে মুসলমানদের জন্য নতুন ইতিহাস। ফজরের ছালাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাব্‌রি চুলের অধিকারী টগবগে এক যুবকের নেতৃত্বে অন্য মুছল্লীদের মতই পবিত্র হারাম শরীফে প্রবেশ করল কয়েকটি কফিনসমেত বেশ কিছু লোক। ঘটনার সূত্রপাত হতে বাকী আরও কিছুক্ষণ। হারামের সম্মানিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইইল-এর ইমামতিতে সবেমাত্র সমাপ্ত হয়েছে ফজরের ছালাত। অব্যবহিত পরেই কফিন থেকে বের হতে লাগল অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। কতিপয় গুলির শব্দে স্তম্ভিত পবিত্র হারামের উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ। একে একে গুলি হত্যা করা হল হারামের নিয়োজিত সকল নিরাপত্তারক্ষীকে। পরক্ষণেই কালো কুচকুচে শ্মশ্রুষামণ্ডিত এক যুবক বন্দুকসমেত সামনে অগ্রসর হন। অতঃপর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইইলের কাছ থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নেন এবং একের পর এক বলতে শুরু করেন সউদী সরকারের দুর্নীতির বিভিন্ন দিক। দীর্ঘকায় যুবক ঈমাম মাহদীর আগমন সম্পর্কিত রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, যখন সারাবিশ্ব অন্যায় এবং পাপ কর্মে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। যুবকটি আরও ঘোষণা করলেন, এটাই সেই সময় যখন ইমাম মাহদীর আগমনের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর ইমাম মাহদী আমাদের মাঝেই বর্তমান রয়েছে। শ্মশ্রুষামণ্ডিত দীর্ঘকায় যুবকের নাম 'জুহাইমান আল ওতাইবী'।

জুহাইমান আল-ওতাইবীর পরিচয় :

ঊনিশ শতকের চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে সঊদী আরবের আল-কাশিম (Al-Qassim) রাজ্যের আল-সাজিরে (Al-Sajir) সম্ভ্রান্ত পরিবারে মুহাম্মাদ ইবনে সাইফ আল ওতাইবীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করে ফুটফুটে একটি পুত্র সন্তান। এই সন্তানই সেদিনকার জুহাইমান আল ওতাইবী। কে জানত এই মিষ্টি শিশুটিই মাত্র তিন যুগের ব্যবধানে পবিত্র হারাম দখল করে হাযার হাযার নারী-পুরুষ এবং শিশুকে জিম্মি করে অধিকার আদায়ের ব্যর্থ অভিযানে নেতৃত্ব দিবে। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন হলেও জুহাইমানের আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার কথা রয়ে গেছে একেবারেই অজানা । হাঁটি হাঁটি পা পা করে মরুভূমির আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা ওতাইবী কৈশোরেই যোগদান করেন সউদী অ্যারাবিয়ান ন্যাশনাল গার্ড (Saudi Arabian National Gaurd) বাহিনীতে। সালটি ছিল ১৯৫৫। সময়ের আবর্তনে জুহাইমান আল ওতাইবীর মধ্যে ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। জুহাইমান স্বীয় প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব ইসলামী শিক্ষায় দীক্ষিত হতে শুরু করেন। ঊনিশ শতকের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। পঞ্চাশ, ষাট এবং সত্তরের দশকে ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে সমাজে প্রচলিত নানা অসংগতি জুহাইমানের মধ্যে ক্রমেই ধর্মের প্রভাব তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করে। তার চোখের সামনেই শুরু হয় সঊদী আরবের তেল সম্পদের জমিদারী কারবার, তার সম্মুখেই সঊদী আরবের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয় বিলাসবহুল সুউচ্চ অট্টালিকা, যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই তার দৃষ্টিগোচর হয় বস্তুকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা, তার অক্ষিসমক্ষেই সংগঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন শহর দখলের বাস্তব ঘটনা, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সঊদী রাজ পরিবারের নানা দুর্নীতি, এখানে সেখানে তার চোখে পড়ছে হিজাব ব্যতীত নারী, তার চোখে প্রতিফলিত হয় ইসলাম বিরোধী নানা কাজ কর্ম। ইসলামী শরী'আহর প্রয়োগরেখা ক্রমেই নিম্নগামী হতে দেখে প্রতিবাদের ভাষা জুহাইমানের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দানা বাঁধতে শুরু করে।।

কর্মজীবন ও উগ্রপন্থী সংগঠন পরিচালনা :

দীর্ঘ আঠার বছর চাকুরী করার পর জুহাইমান ১৯৭৩ সালে 'সঊদী অ্যারাবিয়ান ন্যাশনাল গার্ড' থেকে পদত্যাগ করেন এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তৃণমূল পর্যায়ে মদীনায় দাওয়াতুল মুহতাসিবা (Movement of accountability)-এর সাথে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। এই দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্য ছিল সঊদী সাধারণ জনগণকে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করলেও আস্তে আস্তে দাওয়াতুল মুহতাসিবায় জুহাইমানের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সাথে জুহাইমান তৃণমূল পর্যায়ের দাওয়াতী আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিতে হন বদ্ধ পরিকর। আন্দোলনের স্বাভাবিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য (সাধারণ সঊদী জনগণের মধ্যে দাওয়াতী কাজ) থেকে সরে এসে জুহাইমান সঊদী রাজ পরিবার, শাসক এবং সমাজে প্রচলিত নানা অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দাওয়াতুল মুহতাসিবার প্রতি আহবান জানান। দাওয়াতুল মুহতাসিবা তার দাবী প্রত্যাখান করে তাদের স্বাভাবিক কাজ কর্ম করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। স্বীয় আবেগ এবং কর্মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত না হওয়ায় দাওয়াতুল মুহতাসিবা থেকে বের হয়ে জুহাইমান ১৯৭৬ সালে গঠন করেন 'ইখওয়ান' নামক নতুন একটি সংগঠন। অতঃপর তিনি মদীনা শহর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। জুহাইমান তার নবগঠিত সংগঠনের মাধ্যমে অনেকটা গোপনে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বেশ কিছু ছাত্রকে লক্ষ্য করে কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের অপরাধে জুহাইমান তার কয়েকজন সহযোগীসহ গ্রেফতার হন এবং আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর বিশেষ অনুরোধে বিচার প্রক্রিয়া ছাড়াই মুক্তি পান।

১৯৭৯ সালে প্রকাশ্য দাওয়াতের পাশাপাশি জুহাইমান গোপন কার্যক্রম শুরু করেন, যা ছিল তার একান্ত অনুগত বেশকিছু

লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। গোপন অভিসার জুহাইমানের মধ্যে দিন দিন বিশেষ কিছু করার তীব্র আকাঙ্খা সৃষ্টি করে।

ক্বা'বা আক্রমণের নীলনকশা ও বাস্তবায়ন :

এর পরিপ্রেক্ষিতেই জুহাইমান ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর, ১ মহর্‌রম ১৪০০ হিজরী তারিখে ফজরের পূর্বে পবিত্র হারামে উপস্থিত থাকার লক্ষ্য নিয়ে দুই শতাধিক (ধারণা করা হয় এ সংখ্যা দুই হাযার পর্যন্ত) সহযোগীসমেত মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। জুহাইমানের সহযোগীর অধিকাংশই ছিল মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ও ইসলামী বিষয়াদী সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী, যাদের মধ্যে দু'জন ছিল আফ্রো-আমেরিকান। ফজরের জামা'আত শুরুর পূর্ব মুহূর্তে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাজানো কফিনে ভারী অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে জুহাইমান এবং তার বাহিনীর আগমন ঘটে। উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহকে একজন নতুন নেতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তৎকালীন সময়ে সঊদী আরব এবং হারাম শরীফে নিরাপত্তা তল্লাসীর কোন বালাই না থাকায় খুব সহজে কোন বাধা ছাড়াই জুহাইমান বাহিনী পবিত্র ক্বা'বা শরীফে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

কথিত ইমাম মাহদী :

ক্বা'বার অভ্যন্তরে অনবরত বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন জুহাইমান। বক্তব্যের শুরুতে উপস্থিত মুছল্লীদের মাঝখান থেকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একজনকে উঠে আসার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সকলকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, এই ব্যক্তিই হচ্ছে তোমাদের মাহদী। জুহাইমান মুছল্লীদেরকে তার কাছে বায়'আত গ্রহণের জোরালো আহ্বান জানান। লোকটি ছিলেন জুহাইমান আল-ওতাইবীর শ্যালক মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানী, যিনি কুরাইশ বংশের কাহতান গোত্রের অধিবাসী। জুহাইমান আবারও বলতে শুরু করলেন, হে লোকসকল! এই লোকটির নাম মুহাম্মাদ, যে নামটা ইমাম মাহদীর নাম হবে বলে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ যেমনটা রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সে কুরাঈশ বংশের অধিবাসী, যেমনটা রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। ইমাম মাহদীর আগমন এবং বৈশিষ্ট সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীর অনেক বৈশিষ্ট্য মিলে যাওয়ায় দ্বিধাদ্বন্দে পতিত হন উপস্থিত মুছল্লীদের মধ্যে অনেকেই। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তার নাম হবে আমার নাম, তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নাম, সে হবে আমার বংশধর (কুরাইশ বংশের), সে দুনিয়ায় ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে যেহেতু সে সময়টা থাকবে অন্যায় অপকর্মে ভরপুর *(আবু দাউদ হা/৪২৮২, সনদ ছহীহ)*। জুহাইমান যেহেতু মনে করতেন তখনকার সময়টা ছিল অন্যায় অপকর্মে পরিপূর্ণ, তাই হাদীছে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীকে ইমাম মাহদী হিসাবে মেনে নিতে এবং তার হাতে মুছল্লীদের বাই'আত গ্রহণের আহ্বান জানান।

জুহাইমানের ক্বা'বা আক্রমণের নেপথ্যে কারণ :

অতঃপর জুহাইমান একে একে তার বিভিন্ন দাবী পেশ করতে শুরু করেন। তার উল্লেখ্যযোগ্য দাবী ছিল, টেলিভিশন চ্যানেলে নারীদের নিষিদ্ধকরণ, গান-বাজনা নিষিদ্ধকরণ, সঊদী আরব থেকে আমেরিকাকে বহিষ্কার, আরব উপদ্বীপ থেকে সকল বিদেশী সামরিক এবং বেসামরিক লোকদের বহিষ্কার ইত্যাদি। ইতিপূর্বে জুহাইমান প্রায় পনেরটি পুস্তিকা এবং কলাম লিখতে সমর্থ হন, যার সবগুলোই বর্তমানে নিষিদ্ধ। লেখক হিসাবেও জুহাইমানের ছিল অসাধারণ প্রতিভা। তার প্রতিটি লেখাই ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবধর্মী। বর্তমান সময়ের তরুণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব ইয়াসির কাধী (Yasir Qadhi) তার সবগুলো লেখা অধ্যয়ন করে তাতে পদ্ধতিগত কোন ত্রুটি খুজে পান নি বলে মন্তব্য করেছেন। জুহাইমানের লেখাগুলো ছিল সতর্কতা এবং পূর্বাভাসমূলক। জুহাইমান তার লেখাগুলোতে মূলতঃ বলার চেষ্টা করেছেন, আমরা ইহলোকের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি, আমেরিকা আমদের গ্রাস করতে চলেছে, তারা আমাদের তেল সম্পদ আত্মসাৎ করে চলেছে, আরব উপদ্বীপগুলো দুর্নীতিতে ভরে গেছে, সবকিছুকে পশ্চিমাকরণ করা হচ্ছে; আর এসব ফেতনাহ থেকে মুক্তির জন্য এখন আমাদের দ্বায়িত্ব কিছু একটা করা। কিন্তু জুহাইমান তার কোন লেখায়ই স্পষ্ট করে বলেননি সত্যিকারে তিনি কি করতে চান বা কি করতে তিনি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করছেন। জুহাইমান তার লেখায় সূরা ত্ব-হা-এ আলোচিত মূসা এবং ফেরাউনের উদাহরণ দিয়ে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, তিনি হচ্ছেন মূসা (আ)-এর মত একজন ধার্মিক লোক আর তৎকালীন সময়ের সকল শাসকই ফেরাউনের মত যালিম।

জুহাইমানের হিংস্র আক্রমণ :

এতক্ষণে হারামের অভ্যন্তরে নানান ঘটনা ঘটলেও সে সম্পর্কে বাইরের কারো পক্ষে কিছু জানার যেমন কোন উপায় ছিল না, তেমনি সম্ভব ছিল না হারামের অভ্যন্তর থেকে কারো পক্ষে বের হয়ে যাওয়া। প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই জুহাইমান বাহিনী হারামের সকল ফটক বন্ধ করে দেয়, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা হারামের উপস্থিত হাজী এবং মুছল্লীরা হয়ে পড়েন অবরুদ্ধ। প্রবল ধোঁয়াশার মধ্যে আচ্ছন্ন হয় সঊদী কর্তৃপক্ষ। হারাম শরীফ উদ্ধারে তাৎক্ষণিকভাবে সঊদী সরকারের স্বরাষ্ট মন্ত্রনালয় শতাধিক পুলিশের সমন্বয়ে একটি বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হারাম শরীফের নিকটে ভিড়তে ব্যর্থ হয়। পড়ন্ত বিকালেই সঊদী বাদশাহ আল-মুখাবারাত আল-আমানাহ (Saudi Intelligence)-এর প্রধান প্রিন্স তুর্কি বিন ফায়ছাল আল-সঊদকে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কামান্ডার নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনার সাথে কারা সম্পৃক্ত তা ছিল খুবই অস্পষ্ট। কেউ কেউ ঘটনাটিকে ইরানের শী'আ অথবা আমেরিকা এবং ইসরাইলের ইহুদী চক্রের কার্যক্রম মনে করলেও তা প্রমাণিত হয়নি। ২৫ নভেম্বর বৈরূত থেকে আরব সোস্যালিস্ট অ্যাকশন পার্টি (Arab Socialist Action Party) নামক একটি সংগঠন জুহাইমান বাহিনীর দাবী দাওয়ার স্বপক্ষে ব্যাখ্যা প্রকাশ করলেও ঘটনার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে।

কা'বার ইমামের কৌশল ও অপরাধীদের শনাক্ত :

এদিকে হারাম শরীফের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইইল কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করায় স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন ঘটনাটি উগ্রপন্থি কতিপয় লোকের বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি সুকৌশলে সাধারণ মুছল্লীদের সাথে মিশে যান এবং হিজাবসমেত নারী পোষাক পরিধান করে অন্যদের সাথে পবিত্র ক্বা'বা শরীফ ত্যাগ করতে সমর্থ হন। ক্বাবা শরীফ থেকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইইলের প্রস্থানের পরই মূলতঃ কর্তৃপক্ষ মূল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়। কর্তৃপক্ষ নিজেদের মধ্যে একের পর

এক কথোপকথন, আলোচনার পর আলোচনা চালাতে থাকেন একটা সুষ্ঠু সমাধান বের করার উদ্দেশ্য।

ইমাম মাহদীকে নির্বাচনে বিভক্তি :

অন্যদিকে প্রকৃত ঘটনা না জানার কারণে এবং মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ইমাম মাহদীর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যাওয়ায় দ্বিধাদ্বন্দে পতিত হন নামকরা আলেমগণ। অনেকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীকে আসল ইমাম মাহদী ভেবে বসেন। কোন কোন আলেম হারাম শরীফ উদ্ধারে সেনাবাহিনী পাঠানো সংক্রান্ত ফৎওয়া জারি করতেও অস্বীকার করেন। অন্যদিকে সমকালীন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্ব আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) জুহাইমানের শিক্ষক এবং জুহাইমানের প্রকাশ্য দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সমর্থক হলেও জুহাইমান কর্তৃক পবিত্র হারামকে জিম্মী করাটা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর নেতৃত্বে কতিপয় শায়খ পবিত্র হারাম শরীফ ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে সেনাবাহিনী পাঠানো সংক্রান্ত ফৎওয়া জারি করেন।

ইমাম মাহদী সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মিল থাকলেও কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদী হবেন রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর, তিনি হবেন একজন সাধারণ মানুষ এবং এক রাতে আল্লাহ তাকে বিশেষায়িত করবেন *(ইবনে মাজাহ হা/৪০৮৫, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অনুযায়ী ইমাম মাহদীর আগমনের সময়ে তখনকার আরবে গৃহযুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর সঊদী আরবে আদৌ কোন গৃহযুদ্ধ বিরাজমান ছিল না। বরং বর্তমানের তুলনায় সে সময়টা ছিল অধিকতর শান্তিপূর্ণ এবং অধিকতর ইসলামিক। তাছাড়া ইমাম মাহদী হবেন ইনছাফ প্রতিষ্ঠাকারী সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বিজয়ী ব্যক্তি। তিনি কখনো আটক হবেন না। এ সকল অসামাঞ্জস্যতা এবং ক্ষমতার প্রতি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীর মোহ শেষ পর্যন্ত সকলকে সত্য এবং সঠিক বিষয়টি বুঝতে দারুণভাবে সহযোগিতা করে। শুধুমাত্র ওলামারাই নন দ্বিধাদ্বন্দে পতিত হন সেনাবাহিনীতে কর্মরত সৈনিক কর্মকর্তারাও। শীর্ষ আলেমদের ফৎওয়া সত্ত্বেও হারাম শরীফে রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়ায়, কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীকে সত্যিকারের ইমাম মাহদী মনে করায় এবং সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের কারণে সেনাবাহিনীতে কর্মরত অনেকেই হারাম শরীফ উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করতে অপরাগতা প্রকাশ করে। জ্ঞানের স্বল্পতা এবং সংকটময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীকে ইমাম মাহদী হিসাবে মেনে নিতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গভীর সংকটের মধ্যে আপতিত হয় কর্তৃপক্ষ। শুধু নাম, পিতার নাম কিংবা বংশ পরিচয়ে নয়, চেহারার বিবরণেও ছিল হুবহু মিল। রাসূল (ছাঃ) ইমাম মাহদীর চেহারার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, ইমাম মাহদী হবে প্রশস্ত কপাল এবং লম্বা নাসিকা বিশিষ্ট *(আবুদাঊদ হা/৪২৮৫, সনদ হাসান)*, যা বর্তমান ছিল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীর চেহারার প্রতিফলনে। এমন অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে কোন লোকের জন্যই কষ্টসাধ্য। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাযার লোকের খাবারের ব্যবস্থা না করতে পেরে ঘটনা শুরুর দুই তিনদিন পর অন্যান্য মুছল্লীদের পবিত্র হারাম থেকে বের করে দেয় জুহাইমান বাহিনী। তবে নিজ বাহিনীর আহারের জন্য তারা ছিল নিশ্চিন্ত। তখনও তাদের সঙ্গে মজুদ ছিল বিপুল পরিমান খেজুর, যা তারা ক্বা'বা শরীফে প্রবেশের প্রাক্কালে সঙ্গে নিয়েছিল। আর অতিরিক্ত হিসাবে ছিল যমযমের পানি।

বিভীষিকাময় পরিস্থিতির অবতারণা :

ততদিনে এক সপ্তাহ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ সময়ে কোন অমুসলমান, কাফের কিংবা মুশরিকদের দ্বারা নয়; সমাজে ন্যায় এবং ইসলামী রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠা করার দাবীতে হারাম শরীফ জিম্মি করা জুহাইমান বাহিনীর হাতে রক্তপাত ঘটে নিষিদ্ধ এই পবিত্র অঙ্গনে। সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে নষ্টামি দূর করতে গিয়ে জুহাইমান লঙ্ঘন করে বসেন আল্লাহ্‌র পবিত্র কুরআন। বড় বড় অপরাধ, অপকর্মের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে গিয়ে জুহাইমান করে বসেন মস্তবড় অপরাধ। মুসলমানরাতো বটেই জুহাইমানের এমন জঘন্যতায় আশ্চর্য হন সারাবিশ্বের অমুসলিমরাও। হারাম শরীফ দখল করার প্রাক্কালেই হত্যা করা হয় সকল নিরাপত্তরক্ষীদের। পরবর্তী কয়েক দিনে হত্যা করা হয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সদস্যকে যারা তথ্য সরবরাহ কিংবা হারামের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃত লাশগুলো সংগ্রহের জন্য পবিত্র হারামের পানে কদম ফেলেছিলেন। হারামের চারিদিকে নজরদারী স্থাপন করা এবং ক্বা'বা শরীফে যাতে কেউ জীবিত ঢুকতে না পারে, সেজন্য জুহাইমান বাহিনী কর্তৃক হারামের সুউচ্চ মিনারের উপরিভাগে আগেই নিয়োজিত করা হয় বন্দুক চালনায় অতিদক্ষ কতিপয় সদস্যকে। যখনই কেউ ক্বা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হয়েছে, মিনারের উপর থেকে সাথে সাথেই তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। জুহাইমান বাহিনীর হাতে নিহত নিরাপত্তারক্ষী কিংবা পুলিশের কোন সদস্যের লাশ নিতেও কেউ ভিড়তে পারেনি। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে লাশগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। আশ্চর্যজনকও বটে! পবিত্র ক্বা'বা শরীফ এবং এর আশপাশ রক্তের বন্যায় ভাসিয়েছে যারা, তারাই বলছে মানবতার কথা, তারাই বলছে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা?

নৃশংস ঘটনাকে কঠোর হস্তে দমন :

সুবিশাল ট্যাঙ্ক এবং সমরাস্ত্রের বহর নিয়ে হারামের চারিদিকে অবস্থান নেয় বিশেষ বাহিনী। হারামের আকাশে চক্কর দিতে থাকে হেলিকপ্টার। পবিত্র হারাম শরীফে বিশেষ বাহিনীর প্রবেশের পূর্বমুহূর্তে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জুহাইমান এবং তার বাহিনীকে মাইকে বারবার আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানানো হয়। ঘোষণা করা হয়, 'তোমরা যা করছ তা মোটেও আল্লাহকে খুশি করে না এবং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরণের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। সেজন্য কিং খালিদের পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আত্মসমর্পণ কর এবং অস্ত্র জমা দাও'। কিন্তু জুহাইমান তার দাবীতে থাকে অটল অবিচল। জুহাইমানও ক্বা'বা শরীফের অভ্যন্তর থেকে তার দাবী দাওয়া ঘোষণা করতে থাকে। মোটকথা সঊদী রাজ পরিবারের ক্ষমতা

হস্তান্তর করার আগ পর্যন্ত জুহাইমান পবিত্র হারাম শরীফকে জিম্মিদশা হতে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানান। সুষ্ঠু কোন সমাধানে পৌছতে না পেরে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা সাপেক্ষে আটদিন পর জুহাইমান বাহিনীর কবল থেকে ক্বা'বা শরীফ উদ্ধার করতে বিশাল ট্যাংকের বহর নিয়ে বিশেষ বাহিনী হারাম শরীফের প্রধান ফটকগুলো ভেঙ্গে পবিত্র হারাম শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পবিত্র ক্বা'বা শরীফের অভ্যন্তরে শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। অবিশ্বাস্য! মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, সামনাসমানি গুলি করে হত্যা করছে একে অপরকে। জুহাইমান বাহিনী ক্ষমতার জন্য, বিশেষ বাহিনী ক্বা'বা শরীফ মুক্ত করার জন্য। যুদ্ধের মাত্রা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে শুরু করল। জুহাইমান বাহিনী অবস্থান নিল হারাম শরীফের ভূ-গর্ভস্ত অংশে, একটিমাত্র ফটক থাকার সুযোগ নিয়ে জুহাইমান বাহিনী ফটকে তাদের সশস্ত্র অবস্থান সুসংহত করে। সেখানে প্রবেশের সাথে সাথেই অনেককে গুলি করে হত্যা করা হয়। কোনভাবেই দমানো যাচ্ছিল না জুহাইমান বাহিনীকে। একের পর এক কৌশল অবলম্বন করতে লাগল বিশেষ বাহিনী।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আলোচনার পর আলোচনা তখনও শেষ হয়নি। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করে। অবশেষে ক্বা'বা শরীফ উদ্ধারে নিয়োজিত বিশেষ বাহিনীর কৌশলের কাছে পরাজিত হতে হয় জুহাইমান এবং তার বিপদগামী সহযোগীদের। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে (মতান্তরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান) বিশেষ বাহিনী হারামের ভূ-গর্ভস্ত অংশের অভ্যন্তরভাগ পানি দিয়ে অর্ধপূর্ণ করে দেয়। অতঃপর পানিতে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে জুহাইমান বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। বৈদ্যুতিক শকে জীবিত সকলের দেহ কালো বর্ণ ধারণ করে, যা তাদের ছবিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধে পরাজয় হয় জুহাইমান এবং তার বাহিনীর। মৃত্যু হয় কথিত ইমাম মাহদী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানীসহ জুহাইমান আল-ওতাইবীর অসংখ্য সহযোগীর। আহতবস্থায় আটক করা হয় জুহাইমান আল-ওতাইবী এবং তার প্রায় সত্তরজন সহযোগীকে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে কেটে যায় দুই সপ্তাহ। কষ্ট হলেও মেনে নিতে হচ্ছে এই সময়ে পবিত্র হারাম শরীফে কোন মুছল্লী প্রবেশ করতে পারেনি, আযানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসেনি ক্বা'বা শরীফের সুউচ্চ মিনার থেকে, দুই সপ্তাহ ক্বাবা শরীফে কোন ছালাত হয়নি, হয়নি কোন ত্বাওয়াফ। যদিও সময়টি ছিল হজ্জের মৌসুম।

ধারণা করা হয় জুহাইমান কর্তৃক কা'বা শরীফ জিম্মি করার ঘটনায় দুই হাযারেরও বেশি মুসলমানের মৃত্যু হয় যদিও অফিসিয়ালী এ সংখ্যা প্রায় চারশ'। জুহাইমান গ্রেফতার হওয়ার পরেও অনেক ওলামা দ্বিধাদ্বন্দে উপনীত হন; তারা জুহাইমানের মধ্যে বেশ কিছু ভাল গুণাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ওলামা আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ), শেখ মুখবিল, শেখ বদীউদ্দীন শাহ সিন্দীসহ অনেকেই ছিলেন জুহাইমানের ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এমনকি বিপদগামী হওয়ার আগ পর্যন্ত অনেকেই জুহাইমানের সহযোগী ছিলেন। এ ঘটনায় যেহেতু কথিত ইমাম মাহদীর মৃত্যু হয়েছিল, তাই এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানী ইমাম মাহদী ছিলেন না। তাছাড়া শায়খ বিন বায (রহঃ) এ ব্যাপারে একটি দারুণ ফায়ছালা প্রদান করেন। তিনি বলেন, যদি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-কাহতানী ইমাম মাহদী হন, তাহলে তো তিনি গ্রেফতার হবেন না কিংব মরবেনও না। অথচ সে মরেছে।

রূঢ় বাস্তবতা :

তখনকার প্রেক্ষাপটে ব্যাপারটি মোটেও এত সহজ ছিল না। অবাক হওয়ার মত হলেও বাস্তব সত্য পবিত্র হারাম শরীফে রক্তপাতের মত ঘটনা ঘটালেও জুহাইমান শেষ অবধি মনে করেছিলেন সেই সঠিক পথে রয়েছে এবং আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন। বন্দী অবস্থায় জুহাইমান মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকিতীর নেতৃত্বে মদীনার কয়েকজন প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য কারও সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেন। জেলখানায় দেখতে গিয়ে মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকিতী জুহাইমানের সাথে কোলাকুলি করেন, এ সময় তাদের উভয়ের চোখ ছিল অশ্রুসজল। আশ-শানকিতী জুহাইমান কাছে তার কৃতকর্মের কারণ জানতে চান। অতঃপর জুহাইমান বলেন, সমসাময়িক সমাজে চলমান বিশৃঙ্খলা তাকে একাজে প্রেষনা যুগিয়েছে, যদি তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে হয়ত আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। জুহাইমানের নিষ্ফল অভিযানের ফলে সত্যের সুমহান পতাকা আবারও উম্মোচিত হয় সর্বত্র। অবশেষে ১৯৮০ সালের ৯ জানুয়ারী হারাম শরীফের অদূরে জুহাইমান এবং তার সহযোগীদের প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৯৮০ সালের ৯ জানুয়ারী একটি সময়কাল, যে সময়ে মুসলমানদের জন্য রচিত হয় নতুন ইতিহাস, যা কলঙ্কজনক একটি অধ্যায়।

নোট :

(১) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমি অদ্ভুদ কিছু স্বপ্ন দেখেছি আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক ক্বা'বা শরীফ আক্রমণে মনস্থ করবে। কুরাইশ বংশের একজন লোক ক্বা'বা শরীবে আশ্রয় গ্রহণ করবে। অতঃপর একটি সেনাদল তাকে আক্রমণ করতে ক্বা'বা শরীফের দিকে আগ্রসর হবে। যখন সেনাদলটি বাইদাহ নাকম স্থানে পৌছবে, তখন আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠ খুলে দিবে (ভুমিকম্প) এবং পুরো সেনাবাহিনী তার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আয়েশা (রা) বললনে, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেখানেতো অনেকে থাকবে, যারা ক্বা'বা শরীফ আক্রমণে অনিচ্ছুক। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে, অতঃপর নিয়ত অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে উত্থিত করা হবে *(বুখারী হা/২১১৮; মুসলিম হা/৭৪২১)*।

(২) "....আর মসজিদে হারামের কাছে যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমরাও যুদ্ধ করো না । কিন্তু যদি তারা সেখানে যুদ্ধ করতে সংকোচবোধ না করে, তাহলে তোমরাও নিসংকোচে তাদেরকে হত্যা করো । কারণ এটাই এই ধরনের কাফেরদের যোগ্য শাস্তি' *(বাক্বারাহ ২/১৯১)*।

হেলসিংক, ফিনল্যাণ্ড।

গ্রন্থপঞ্জী

1) The Mahdi between facts and fictions by Abu Aammar Yasir Qadhi
2) Hindsight is 20/20 by Abu Aammar Yasir Qadhi
3) http://forums.islamicawakening.com
4) http://www.wikipedia.com

বিশ্বাস করতে পারিনি ঈশ্বর মারা গেছেন- আব্দুর রহীম গ্রীণ

-অনুবাদক : কে,এম, রেযওয়ানুল ইসলাম

কেন আব্দুর রহীম গ্রীণ ইসলাম গ্রহণ করলেন?

তানজানিয়ার রাজধানী দারুস সালামে আমার জন্ম। সেখানে আমার বাবা বিলুপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন ঔপনিবেশিক প্রশাসক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এই তো কয়েক দশক পূর্বেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সমগ্র ভূ-ভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে সেই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব শুধুমাত্র ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে বিদ্যমান আছে। বাকি সবই কালের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। সবকিছু কত দ্রুত বদলায়! কিভাবে ক্ষমতাবানদের পতন ঘটে! এসব বাস্তব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই মহাক্ষমতাবান আল্লাহ কুরআনে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করে অতীতের ক্ষমতাধরদের করুন পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে পারি যারা এক সময় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ছিল এই পৃথিবীতে। যাইহোক, আমার বাবার কথায় ফিরে আসি যিনি আমার জন্মের সময় তানজানিয়ার ঔপনিবেশিক প্রশাসক ছিলেন। বাবা-মা আমার নাম রাখলেন অ্যান্থনী ভ্যাটসফ গ্যালভিন গ্রীন। আমার মনে হয় আপনারা আমার নাম দেখে হাসছেন। ভ্যাটসফ একটা পোলিশ নাম। কারণ আমার মা ছিলেন পোলিশ।

ক্যাথলিক শিক্ষা :

পোলিশ হওয়ায় আমার মা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। তাই তিনি চেয়েছিলেন যে, আমি এবং আমার সহোদর ডানকান (ডানকান চার্লস আলেকজাণ্ডার গ্রীন) যেন আদর্শ ক্যাথলিক হিসাবে বড় হই। ফলে বলতে গেলে আমাদের জন্মের দিনই আমাদের নাম একটি বিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক আবাসিক স্কুলে তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই স্কুলটি একটি মঠ বা আশ্রম জাতীয় আবাসিক স্কুল। তার মানে হল, ঐ স্কুলে সন্ন্যাসীরা (খ্রিষ্টান নান) বাস করেন এবং পড়ান। স্কুলটির নাম হল 'অ্যামপ্লিফোর্থ কলেজ', যা উত্তর ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারে অবস্থিত। আমার বয়স যখন ২ বছর তখন আমরা দারুস সালাম ছেড়ে চলে আসি। আমার ছোট ভাইয়ের জন্ম লন্ডনে। যখন তার বয়স প্রায় ৮ বছর আর আমার প্রায় ১০ বছর তখন আমাদেরকে সেই আবাসিক স্কুলে পাঠানো হয়। সুতরাং ১০ বছর বয়সেই আমাকে অ্যামপ্লিফোর্থ কলেজের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে হয়। মনে পড়ে, স্কুলে পাঠানোর পূর্বে মা আমাদের ক্যাথলিকদের কিছু উপাসনা পদ্ধতি এবং রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে করে অন্যরা বলতে পারে যে, 'আশ্রম' স্কুলের নতুন জীবনের জন্য তিনি আমাদেরকে ভালমতো প্রস্তুত করতে পেরেছেন। মা আমার বাবাকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন যিনি, ছিলেন একজন অজ্ঞেয়বাদী (জড়বস্তু ছাড়া অন্য কিছু বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভব নয়, বলে যারা বিশ্বাস করে)। সবাই ধারণা করেছিল তিনি হয়তো কোন ক্যাথলিককে বিয়ে করবেন, কিন্তু তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে আমার বাবাকে বিয়ে করেছিলেন। যাইহোক, তিনি নিজেকে খুব একনিষ্ঠ ক্যাথলিক মনে করতেন না। কিন্তু আমাদের দু'ভাইকে ঐ ক্যাথলিক স্কুলে পাঠিয়ে তিনি তা হ'তে চেয়েছিলেন। মনে পড়ে এক রাতে তিনি আমাকে একটি প্রার্থনা শেখালেন, যে পদ্ধতিতে ক্যাথলিকরা প্রায়ই উপাসনা করে থাকে। সেটি ছিল ক্যাথলিকদের একটি অন্যতম প্রধান প্রার্থনা, যা বার বার করা হয়। এ সময় তাদের হাতে জপমালা থাকে, যার দ্বারা তারা তাদের ধারাবাহিক প্রার্থনা গণনা করে। তাদের প্রধান প্রার্থনার শিরোনাম হল, 'হে মেরী' (Hail Mary)। এই উপাসনা এভাবে শুরু হয়- 'হে মেরী! ঈশ্বরের জননী, তুমি আর্শীবাদ কর সকল মহিলাদেরকে এবং আর্শীবাদ কর তোমার গর্ভের সন্তান যিশুকে'। নয় বছর বয়সে প্রথম মাকে আমি এভাবে প্রার্থনা করতে শুনি, 'হে মেরী! ঈশ্বরের জননী'। মনে মনে ভাবলাম, 'ঈশ্বরের কিভাবে মা থাকতে পারে?' ঈশ্বর তো এমন, যার কোন শুরু নেই এবং শেষও নেই। তাহলে কিভাবে ঈশ্বরের 'মামনি' থাকতে পারে? বসে বসে এই ঈশ্বরের মা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলাম এবং নিজেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। যদি মেরী ঈশ্বরের গর্ভধারিণী মা হয়েই থাকেন, তবে তাকেই তো প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর অপেক্ষা বড় ঈশ্বর গণ্য করা উচিত।

পাপ স্বীকার-এর কারণ কী :

স্কুলে যাওয়ার পর বেশী বেশী পড়াশোনা এবং চিন্তা ও গবেষণা করতে শুরু করলাম। তখন মাথার মধ্যে আরো প্রশ্নের উদয় হতে লাগল। স্কুলে আমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে 'পাপ স্বীকার' করতে হত। যাজক বলতেন, 'তোমাদেরকে অবশ্যই ছোট-বড় সকল অপরাধ স্বীকার করতে হবে। যদি সব পাপ স্বীকার না কর, তবে পাপ স্বীকারের কোন মূল্যই নেই এবং তোমাদের কোন পাপই ক্ষমা করা হবে না'। কল্পনা করতে পারেন? ১০-১১ বছর বয়সের স্কুল বালকদেরকে ১৯-২০ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত সকল অপরাধ স্বীকার করে যেতে হবে! উপরন্তু এমন ব্যক্তিদের কাছে করতে হবে, যারা আমাদের আবাসিক শিক্ষক। অন্য কথায় যারা আমাদের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। এটা হল একটা মারাত্মক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র, যাতে পাপ স্বীকার করিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আমি তাদের প্রশ্ন করতাম, কেন আপনাদের কাছে নিজের সব পাপকর্ম স্বীকার করব? কেন সরাসরি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না? আসলে বাইবেল অনুযায়ী যিশু বলেছেন যে, শুধু পিতার (ঈশ্বর) কাছেই আমাদের অপরাধ মার্জনার জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন। তবে কিসের জন্য যাজকের শরণাপন্ন হতে হয়?"তারা আমাকে বোঝাতেন; 'ঠিক আছে, তুমি ঈশ্বরের কাছেও ক্ষমা চাইতে পার, যদি তুমি চাও। কিন্তু তুমি নিশ্চিত হতে পার না ঈশ্বর তোমার নিবেদন আদৌ শুনবেন কি-না।" ব্যাপারটা নিয়ে সমস্যায় পড়লাম। চার্চের অন্য মতাবাদগুলো নিয়েও সমস্যায় পড়লাম। তবে সবচেয়ে বেশি দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লাম যে মতবাদ নিয়ে তা হল অবতারবাদ-"একটা ধারণা যা বলে ঈশ্বর মানুষ হয়ে মর্ত্যে এসেছিলেন।"

মিশরে কাটানো ছুটির দিনগুলো :

যখন ১১ বছরে পা দিই ঠিক তখনই বাবা মিশরে একটি চাকুরী পেলেন। তিনি বার্কলেস ব্যাংকের কায়রো শাখার মহাব্যবস্থাপক হলেন এবং তার ফলে আমার পরবর্তী ১০ বছরের ছুটিগুলো মিশরেই অতিবাহিত হয়েছিল। কাজেই আমাকে ইংল্যান্ডের

স্কুলেও যেতে হতো, আবার ছুটি পেলে মিশরেও আসতে হতো। আপনারা জানেন, পশ্চিমা সমাজ আমাদের একটা সমীকরণ শিক্ষা দিয়ে থাকে। তারা বলে, ধন-সম্পদ=সুখ-শান্তি। আপনি যদি সুখী হতে চান এবং জীবনটাকে ভালভাবে উপভোগ করতে চান, তবে আপনার দরকার প্রচুর টাকা-পয়সা। কারণ টাকা-পয়সা থাকলে আপনি সুন্দর গাড়ী, টিভিসেট ইত্যাদি যেমন কিনতে পারবেন আবার সিনেমা দেখতে কিংবা অবকাশ যাপনেও বের হতে পারবেন। পাশাপাশি আপনার জীবনকে সুখী করতে অপরিহার্যভাবে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন তাও কিনতে পারবেন। তারা সব সময় এই দর্শনই প্রচার করে, যদিও বাস্তবে ব্যাপারটা আদৌ তা নয়।

আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ঐ স্কুল আমার কখনোই ভাল লাগত না। নিজেকে প্রশ্ন করতাম, আমি তো আবাসিক স্কুল একদমই পসন্দ করি না তাহলে কেন আমি আমার সবকিছু, সব আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে শত শত মাইল দূরবর্তী ইয়র্কশায়ার মুরসের এই স্থানে পড়ে আছি। 'কিন্তু কেন? নিজের বিবেককে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবানে বিদ্ধ করতাম। মিশরের জীবনই আমার প্রিয় ছিল। যখন ইংল্যান্ডে ফিরে যেতাম তখন ভাবতাম, কেন আমি এখানে? আরও ভাবতাম, জীবনের লক্ষ-উদ্দেশ্য কী? কিসের জন্য আমরা বেঁচে আছি? এত সব কিছুর অর্থ কী? ভালবাসা মানে কী? আমাদের জীবন কিসের জন্য? এই জীবনের প্রকৃত স্বরূপই বা কেমন? এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে থাকলাম এবং অবশেষে একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম। 'হ্যাঁ, আমি আজ এই স্কুলে আছি কঠোর পরিশ্রম করার জন্য, যাতে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করতে পারি, যাতে কোন ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারি, যাতে ভাল বেতনের একটা চাকরি পাই যা আমাকে অঢেল টাকার যোগান দেবে। যাতে করে যখন আমি বিয়ে-শাদী করব এবং আমার সন্তানাদী হবে তখন যেন আমি তাদের সেই একই রকম ব্যয়বহুল প্রাইভেট স্কুলে পাঠাতে পারি এবং যাতে করে তারা আবার কঠোর পরিশ্রম করে বড় ডিগ্রী লাভ করতে পারে। যাতে তারাও একটা ভাল চাকুরী পায়, যাতে করে যখন তাদের আবার সন্তান-সন্ততি হবে তখন যেন তাদেরও যথেষ্ট ধন-সম্পদ থাকে, যাতে তাদের সন্তানদেরও আবার সেই একই রকম স্কুলে ভর্তি করানো যায়। বুঝলেন? অবশেষে নিশ্চিত হলাম। এই তো! এটাই তো আমাদের সবার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য! তাহলে এই উদ্দেশ্য পূরনের জন্যই কি বিশ্ব-সংসারে এত কিছুর আয়োজন? মনে মনে বললাম, অসম্ভব। এটাই জীবনের একমাত্র লক্ষ-উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাহলে কোন্‌টি জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য?

উত্তরের সন্ধানে : আমার মনে কৌতূহল উদয় হল। আসলে সত্য জানার প্রতি আমার এই দুর্বার আগ্রহ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বরং তা সৃষ্টি হয়েছে যখন থেকে আমি চিন্তা-গবেষণা শুরু করি এবং অন্যান্য ধর্ম এবং দর্শনগুলোর মধ্যে ও জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের প্রকৃত স্বরূপের সন্ধান করতে শুরু করি এই আশায়, হয়তো সেগুলোর কোন একটি আমাকে তার সন্ধান দিতে পারবে। ১৯ বছর বয়সে আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। যে ১০ বছর আমি মিশরে ছুটি কাটিয়েছিলাম সে দীর্ঘ সময়ে শুধুমাত্র ১ জন ব্যক্তির সাথেই ইসলাম নিয়ে আমার গঠনমূলক আলোচনা হয়েছিল। যদিও ক্যাথলিক ধর্ম সম্পর্কে আমার নিজেরই অনেক প্রশ্ন ছিল। তবুও কেউ যখন আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাত বা আক্রমণ করত তখন আমি বলিষ্ঠভাবে তার প্রতিবাদ করতাম। তখন আমি হয়ে পড়তাম ধর্ম রক্ষক, যদিও আমি নিজেই তা মন থেকে বিশ্বাস করতাম না। এটা ছিল একটা বিস্ময়কর স্ববিরোধিতা। যাইহোক, সেই মিশরীয় ব্যক্তির কাছে আমার অসংখ্য প্রশ্ন ছিল। কিন্তু প্রথমে ভেবেছিলাম তিনি আর কতটুকুই বা জানেন? আমরা হলাম ইংরেজ। এই তো ক' বছর আগেও আমরা এই তুচ্ছ দেশটা শাসন করতাম।

মনে হল যেন মাইক টাইসন আমার মুখে ঘুষি মারল :

৪০ মিনিট ধরে চলা সেই কথোপকথনের শেষে তিনি আমায় কয়েকটি সাধারণ প্রশ্ন করলেন, যেগুলো আজ অবধি আমার মস্তিষ্কে বিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সুতরাং আপনি বিশ্বাস করেন যে, যিশুই হলেন ঈশ্বর?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করেন যিশু ক্রশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন?' জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে'। তখন তিনি তার মোক্ষম অস্ত্রটি ছুঁড়লেন, 'তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর মারা গেছেন?' তিনি যখন এই বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, তখন জানেন আমার কী ত্রাহি অবস্থা হয়েছিল? মনে হল যেন এইমাত্র মাইক টাইসন তার মুষ্টি দিয়ে আমার মুখে জোরসে এক ঘুসি মারলেন। আমি সম্পূর্ণরূপে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ সাথে সাথেই আমি আমার বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা এবং নিজের বোকামিটা ধরতে পেরেছিলাম। অবশ্যই এটা বিশ্বাস করা যায় না যে, ঈশ্বর মারা গেছেন। আপনি তো ঈশ্বরকে খুন করতে পারেন না। এতদিন ধরে আমাকে যা কিছু জানানো হয়েছে, যা কিছু শেখানো হয়েছে, যেগুলো নিয়ে আমি সব সময়ই অস্বস্তিতে থাকতাম সেই সব শিক্ষার অসারতা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেল। উপলব্ধি করলাম, না। আমি তো বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বর মারা গেছেন। কিন্তু আমি সেই লোকের সামনে তা স্বীকার করতে রাজি ছিলাম না। তাই বললাম, 'ওহ এটাতো কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু আমাকে এখন বাড়ি ফিরতে হবে। বিদায়'। আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে চাচ্ছিলাম না। তাই সেখান থেকে চলে আসলাম। সিগারেট ধরালাম, কফি পান করতে লাগলাম। তারপর লেখালেখি বা অন্য কিছু করেও সেই লোকটির বলা কথাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে সাধ্যমত চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। সেই কথোপকথনটা ছিল আমার জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। আপনারা এটাকে আমার পুনর্জন্মও বলতে পারেন। আপনারা যারা সত্যের সন্ধানে আধ্যাত্মিক সফর করছেন, হয়তো আপনাদের অনেকেই ইসলামকে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না। কিন্তু আমি ছিলাম কিছুটা ব্যতিক্রম। তাই সব কিছু নিয়েই আমি মাথা ঘামিয়েছিলাম আর এজন্যই আমি লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। বস্তুত ১৯-২০ বছর বয়সে আমি ছিলাম এক হিপ্পি (অদ্ভুত বেশ-ভূষার মাধ্যমে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব প্রকাশকারী ব্যক্তি)। সে সময় আমি নিজের জন্য এক নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করলাম। যা ছিল এক জগাখিচুড়ী ধর্ম। কারণ যে সব ধর্ম নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছিলাম সেগুলোর প্রত্যেকটি থেকে কিছু কিছু অংশ একত্রিত করে আমি সেই বিশেষ ধর্ম উদ্ভাবন করলাম। কিন্তু এই নব্য ধর্ম নিয়ে আমি বেশী দূর এগোতে পারিনি। কারণ এটা ছিল এক রকম ময়লা আবর্জনার স্তূপ। যে সব বিধি-বিধান আমি সে ধর্মে যোগ করেছিলাম, সেগুলো ছিল একেবারেই জঘন্য।

ধর্মকে ভুলে যাও : কিভাবে সম্পদের পাহাড় গড়া যায়?

নিজেকে বললাম, ভুলে যাও। ধর্মের বিধি-বিধানের কথা বেমালুম ভুলে যাও। আধ্যাত্মিকতার কথা চিরতরে ভুলে যাও। ভুলে যাও এই সকল গুরুত্বহীন বিষয়। হতে পারে জীবনে ধর্মের কোন গুরুত্ব নেই। হতে পারে জীবনে ধনী হওয়া ছাড়া আর সবই অর্থহীন। আর হতে পারে তোমার প্রধান সমস্যা হল তোমার যথেষ্ট ধনবত্তা নেই। বুঝতেই পারছেন টাকার নেশায় কতটা বুঁদ হয়ে ছিলাম। কারণ ভেবেছিলাম শুধু টাকা-পয়সাই আমাকে সুখী করতে পারে। সে সময় আমার মানসপটে ইয়োটস (দ্রুতগতিসম্পন্ন অত্যন্ত মূল্যবান নৌযান) আর প্রাইভেট জেট বিমান ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। প্রিয় পাঠক, আপনাদের এ যাত্রায় আমার অতীতে নিয়ে যাচ্ছি যাতে অনুমান করতে পারেন তখন আমার জীবন-যাপন পদ্ধতি কেমন ছিল। তখন মনে মনে ভাবতাম, কেমন করে অতি স্বল্প প্রচেষ্টায় অঢেল সম্পদ উপার্জন করা যায়? কষ্ট করতে কে চায় বলুন? কে চায় সমস্ত সময় কাজে ব্যয় করতে? আমরা শুধু ধনসম্পদ চাই আর চাই সেই সমস্ত সম্পদ আয়েশে ভোগ করতে। সুতরাং আমার দরকার অল্প পরিশ্রমে অধিক রোজগার। পাশাপাশি সীমাহীন আনন্দ বিনোদন। তাই ঠিক করলাম, 'ঐসব সফল মানুষদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি, যাদের অনেক ধন-সম্পদ আছে এবং খুঁজে বের করি কিভাবে তারা এত ধনী হলো'। সর্বপ্রথম ব্রিটেনকে বেছে নিলাম। কোন সমস্যা নেই। সীমাহীন প্রাচুর্য। কিন্তু অমানুষিক খাটা-খাটুনি। তাহলে কিসের শিল্প-বিপ্লব? ছ্যাহ! কি সব অন্ধকারাচ্ছন্ন শয়তানের কল-কারখানা। ওফ! ভাবা যায় না। তারপর যাওয়া যাক আমেরিকায়। কী আছে আমেরিকান স্বপ্নে? আপনি একটা নোংরা নর্দমার মধ্যে যেন ইঁদুর দৌড় দৌড়াচ্ছেন আর আপনি তা করছেন মিলিয়নিয়ার হওয়ার নেশায়, যা নিশ্চিতভাবেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ব্যাপার। আর জাপানীরা? হ্যাঁ, তারাও অনেক সমৃদ্ধিশালী কিন্তু তারা যে কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। এরপর সৌদি আরবের কথা আমার মাথায় এলো। তারা তো উটে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তাদেরও অনেক প্রাচুর্য আছে। আহ! এটাই তো চাই। বিন্দুমাত্র ক্লেশ নাই তবুও টাকা আর টাকা। সুতরাং সেখানে আমার জন্য কিছু থাকলেও থাকতে পারে।

কুরআন পাঠ : মনে মনে ঠিক করলাম, অবশ্যই তাদের নিয়ে ভাবা উচিত- তাদের ধর্ম কী, ধর্মগ্রন্থ কী! হ্যাঁ সেটা কুরআন। তাহলে কুরআন নিয়ে একটু চেষ্টা করা যাক না। বলা যায় না, সেখানে কোন অমূল্য রতন থাকলেও থাকতে পারে। বাস্তবিকই, এই ধরনের ভাবনাই আমাকে একটা বইয়ের দোকানে নিয়ে গেল। আমি কুরআনের একটা অনুবাদ কিনে ফেললাম। শুধুমাত্র কৌতূহলই আমাকে কুরআনের সংস্পর্শে নিয়ে আসল। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে আমি কুরআন পড়া শুরু করেছিলাম। কোন নিগূঢ় সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্য আমার ছিল না। কেবল জানার আগ্রহ জেগেছিল যে, এই গ্রন্থ কী বলে। স্রেফ এই কারণেই, নতুবা হয়তো কোনদিনই কুরআনের দ্বারস্থ হতাম না। আমি খুব দ্রুত পড়তে পারি। পরিষ্কারভাবে মনে আছে, তখন আমি ট্রেনে ছিলাম। লন্ডনে টেম্স নদীর তীরে আমি বাস করতাম। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ভিক্টোরিয়া যাচ্ছিলাম। ট্রেনের জানালার পাশের সিটে বসে কুরআনের অনুবাদ পড়তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পড়ার পর অনুধাবন করলাম, 'যদি আমি জীবনে কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থ পড়ে থাকি তবে তা এটাই'। সত্যি বলতে কি ঐ মুহূর্তেই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম এবং বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম যে, কুরআন হল আল্লাহর বাণী। সবসময় আমার একটা অভ্যাস ছিল, কোন কিছু পড়লে তা শুধু ভাসা ভাসা করে পড়তাম না। বরং তা বারবার পড়ে ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করতাম। ভাসাভাসা করে কোন কিছু পড়া ঠিক যেন এমন, আপনি একটা সুস্বাদু রসালো আপেলের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন এবং নাক দিয়ে সেটার মিষ্টি ঘ্রান নিচ্ছেন কিন্তু আপনি জানেন না তার স্বাদ আসলে কেমন। অবশ্যই আপনাকে সেটার স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তারপর একদিন কোন এক মসজিদের লাইব্রেরীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী এবং বিভিন্ন ইবাদাত বিষয়ক বেশ কিছু বই দেখে বেজায় খুশি হলাম। সেগুলো একটা একটা করে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, 'ওয়াও! কী চমৎকার! এখানে কত কী রয়েছে'। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে পাশে দাঁড়াল এবং জানতে চাইল, 'দুঃখিত, আপনি কি মুসলিম?' মনে মনে বললাম 'আমি মুসলিম? কী বলছে লোকটা?' তাকে জবাব দিলাম, 'দেখুন, আমি শুধু বিশ্বাস করি, ঈশ্বর মাত্র একজনই যিনি আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) হলেন তার বার্তাবাহক'। তিনি বললেন, 'তাহলে তো আপনি একজন মুসলিম।' আমি বললাম, 'সত্যি? আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ'। তারপর তিনি বললেন, 'এখন ছালাতের সময়। আপনি কি ছালাতে আসতে চান?' সম্ভবত সেদিন ছিল শুক্রবার। কারণ দিনের মধ্য ভাগেই মসজিদটি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি তো তখনও জুম'আর ছালাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তবুও মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং ছালাতে দাঁড়ালাম। তারপর ছালাত শুরু হতেই হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমার ধারণা, পুরোটা সময় জুড়েই আমি উল্টাপাল্টাভাবে ছালাতের আহকাম আরকানগুলো আদায় করেছিলাম। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই মসজিদের মুছল্লিরা আমাকে ঘিরে ধরল এবং তাদের প্রত্যেকেই মাত্র ৫ মিনিটে আমাকে সম্পূর্ণ ইসলামটাই শেখাতে চাইল। এমন এক বিস্ময়কর অনুভূতি নিয়ে আমি সেদিন মসজিদ থেকে বের হয়েছিলাম যেন এইমাত্র আমার বিক্ষিপ্ত, উত্তপ্ত আত্মাকে কেউ যেন ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে দিল। কল্পনার সুখরাজ্যে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে দেখতে পেলাম আমি শুভ্র, সুন্দর, স্নিগ্ধ মেঘের উপর দিয়ে হাঁটছি। এটা ছিল আত্মিক পরিতৃপ্তির এক অসাধারণ অনুভূতি।

ইতিমধ্যে আমি সত্যি সত্যিই মনে প্রাণে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম। তা সত্ত্বেও সম্পূর্নরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে প্রকৃতপক্ষে আমার আরো প্রায় ২ বছর সময় লেগেছিল। যে ধরনের জীবন যাপনে এতদিন আমি অভ্যস্থ ছিলাম তা পরিত্যাগ করতে বাস্তবিকই অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। আল্লাহ আমাকে ধৈর্যধারণের তাওফীক্ব দিয়েছিলেন। এখনও অতীতের দিকে ফিরে তাকালে সেই দিনগুলো আমায় অনুপ্রেরণা জোগায়, সাহস দেয় আর অনেক বাস্তবতা শিক্ষা দেয়। ঐ ২ বছর ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্বিষহ অধ্যায়। কেন? এজন্য যে, আমি সত্য জানতাম। কিন্তু তা অনুসরণ করতাম না। যদি আপনি অজ্ঞ হন তবে এই অজ্ঞতা আপনার জন্য এক অর্থে আশীর্বাদ। তার মানে হল, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য আপনার অজানা ততক্ষণ পর্যন্ত এক দিক দিয়ে আপনি নিষ্পাপ। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞতা কোনভাবেই আশীর্বাদ নয়। কিন্তু যখন সত্য জানা সত্ত্বেও সে অনুযায়ী আপনি আপনার জীবন

পরিচালনা করছেন না, তখন তো আপনি নিজের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এটা মারাত্মক ভুল, ভয়ানক আত্মপ্রতারণা! আমার ক্ষেত্রেও ঠিক এ ধরনের ঘটনাই ঘটেছিল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আমি ইসলামে ফিরে আসতে পেরেছি। প্রথমদিকে, আমি নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিলে কেউ তা বিশ্বাস করত না। সবসময় বলতাম যে, আমি একজন খাঁটি মুসলিম। কিন্তু অন্যরা আমার সে কথায় মোটেও গুরুত্ব দিত না। অনেক সময় এমনও ঘটত, হয়তো কোন পার্টিতে মদ গিলছি আর অন্যদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছি। তারা তখন উপহাস করে মন্তব্য করত, 'হ্যাঁ, সত্যি? অসাধারণ। বলো আরো বলো'। আমি বলতাম, 'না, আর পারছি না। আমি ভীষণ ক্লান্ত'। আসলে অতিরিক্ত মদ্য পানের কারণে ততক্ষনে আমি নেশাগ্রস্ত। এই ছিল আমার অবস্থা। আর এমনই ছিল আমার ইসলাম। আলহামাদুলিল্লাহ পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ তা'আলা আমাকে সে যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্ত করেছেন, আমায় পথ দেখিয়েছেন। এক সময় আমি প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা শুরু করলাম। আল্লাহ্‌র কাছে শপথ করলাম যে, যদিও আমি ছালাতের নিয়ম-কানূন, দো'আ-দরূদ কিছুই ভাল করে জানি না। তবুও অন্য কোন ইবাদাত না করলেও আমি নিয়মিত ছালাত আদায় করবই। এই চ্যালেঞ্জটা আমি খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করলাম এবং সফলও হলাম। যখন ছালাত সঠিকভাবে আদায় হবে, দেখবেন আপনার সম্পূর্ণ জীবটাই পাল্টে যাবে।

প্রিয় পাঠক, আমি নিশ্চিত এই মুহূর্তে আপনারা আমার কাছ থেকে আরো দু'টি প্রশ্নের উত্তর আশা করছেন।

১ম প্রশ্ন : আপনার মুসলিম হওয়ার অনুভূতি কেমন ছিল?

একটা উপমার সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করছি। ধরে নিন, এক অমাবশ্যার রাতে আপনাকে কেউ সম্পূর্ণ অচেনা একটি পরিত্যাক্ত নির্জন ভূতুড়ে বাড়িতে নিয়ে গেল, যে বাড়ির সর্বত্র চেয়ার, টেবিল, ল্যাম্প ইত্যাদি ভাঙ্গা জিনিসপত্র ছড়ানো ছিটানো রয়েছে। অত:পর সেই নিকষকালো অন্ধকার বাড়িতে আপনাকে একাকী রেখে বাকি সবাই দরজা বন্ধ করে চলে গেল। অনন্যোপায় হয়ে আপনি বের হবার পথ খুঁজতে আরম্ভ করলেন যদিও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ফলশ্রুতিতে এটা ওটার সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন এবং প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। কিন্তু মুক্তির কোন রাস্তা খুঁজে পেলেন না। কাজেই বাধ্য হয়েই আপনাকে সেই অন্ধকার জগতেই বাস করতে হল। 'কুফরী' ব্যাপারটিও ঠিক এমন। আপনার ক্ষেত্রেও ঠিক এমনই ঘটছে, যখন আপনি ইসলাম থেকে বহু ক্রোশ দূরে আছেন। আপনি যেন আঁধার জগতের বাসিন্দা। আপনার আসল গন্তব্য কী তা আপনি জানেন না। কোত্থেকে এসেছেন তাও আপনার অজানা। আপনি এও জানেন না যে, মানবজীবন বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই, সমস্যা-সংকটে পরিপূর্ণ এক অত্যন্ত দুর্গম পথ। আর সেই পথ নিরাপদে পাড়ি দেয়ার উপায়ও আপনার সম্পূর্ণ অজানা। একমাত্র ইসলামই পারে সেই আঁধার ঘরের দরজা উন্মুক্ত করতে, যাতে আপনি যন্ত্রনাময় জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আলোকময় জগতে পা রাখতে পরেন। তখন সবকিছুই আপনার কাছে স্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং অনুধাবন করতে পারবেন সত্যি সত্যিই আপনি বেঁচে আছেন না ইতিমধ্যে আপনার আত্মার মৃত্যু ঘটেছে। ইসলাম বয়ে আনে জ্যোতি, তৃপ্তি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি। তাইতো ইসলাম এত মহান! এভাবেই ইসলামের তুলনা করা যেতে পারে।

আপনাদের ২য় প্রশ্ন হতে পারে : আপনার বাবা-মার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

শতভাগ সততার সাথেই বলছি মুসলিম হওয়ার পর এখন বাবা-মার সাথে আমার সম্পর্ক আগের তুলনায় অনেক অনেক ভাল আলহামদুলিল্লাহ্। আমি বিশ্বাস করি, আপনি যদি বাস্তবিকই বাবা-মার সাথে সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হন, তবে তারা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ইসলাম আপনাকে আরো দায়িত্ববান করেছে। ইসলাম মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করে সর্বোচ্চ সুন্দর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়। যদি এমন আচরণ করা যায় তবে অমুসলিম পিতা-মাতাগণও বলতে বাধ্য হবেন যে, 'ইসলাম এমন এক ধর্ম যা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে এবং আমাদের সাথে আমাদের সন্তানদের সম্পর্ক আরও উষ্ণ করে তুলে'। আলহামদুলিল্লাহ, বাবা-মার সাথে আমার সম্পর্ক সত্যিই খুব ভাল।

[লেখক : ইংরেজী বিভাগ, নর্দান ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী; তাহেরপুর, বাগমারা]

মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ)

-মুহাম্মাদ তামীমুল ইসলাম

ভূমিকা :

ইসলামের ইতিহাসে যে সকল ছাহাবী রাজকীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন, তন্মধ্যে মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আমি মক্কাতে তার চেয়ে সুন্দর কোঁকড়ানো কেশওয়ালা ও ঐতিহ্যবান আর কাউকে দেখিনি’ *(মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৪৯০৪, ৩/২২১)*। তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও মর্মস্পর্শী বক্তব্যের কারণে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে মদীনার চিত্রপট সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি যুবকদের অগ্রগতি, আশা-আকাঙ্খ ও উৎসাহ-অনুপ্রেরণার মূর্তপ্রতীক। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যুবকদের সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার উৎস। নিম্নে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হ’ল।

জন্ম ও শৈশবকাল :

মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ) মক্কার কুরাইশ বংশের সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর মাতা সম্পদশালী হওয়ায় তাকে অত্যন্ত ভোগবিলাসের মধ্যে পরম আদর-স্নেহে লালন পালন করেন। সেইকালে তার মাতা তাকে মক্কার সবচেয়ে দামী দামী পোশাক পরিধান করাতেন। তিনি মক্কার সবচেয়ে বেশি ও উন্নতমানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন *(মুস্তাদরাকে হাকেম ৩/২২১, হা/৪৯০৪)*।

নাম ও বংশ পরিচয় :

মূল নাম মুছ‘আব। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে আবু আব্দুল্লাহ বা আবু মুহাম্মাদ নামে ডাকা হত। আর ইমলাম গ্রহণের পর মুছ‘আব আল-খায়ের বলে ডাকা হত *(আর-রাহীকুল মাখতূম, ২১৪)*। অন্যদিকে মদীনাতে দূত হিসাবে প্রেরিত হওয়ার পর তাকে মুক্বরিয়ূ তথা ক্বারী লক্বব প্রদান করা হয় *(হাকেম হা/৬৬৩৮; রওযুল আনফ ২/২৫১)*।

তাঁর পিতার নাম উমায়ের বিন হাশেম বিন আব্দে মানাফ বিন আব্দুদ্দার বিন কুশাই বিন কিলাব বিন মুররা বিন কা‘ব বিন ফিহর (কুরাইশ)। মাতার নাম খুনাস বিনতু মালেক বিন মুযরাব। তার বংশের উর্ধ্বতন পুরুষ হাশিমের স্তরে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে ।

ইসলাম গ্রহণ :

মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ) প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন মুছ‘আব (রাঃ) যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁর মন ধীরে ধীরে ইসলামের দিকে ঝুঁকতে থাকে। তিনি একদা ‘দারুল আরকামে’ রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গেলেন। সেখানে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন ও তাদের সাথে ছালাত আদায় করতেন। এভাবে মুছ‘আব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তার মা ও কওমের নিকটে গোপন রাখেন। কারণ তিনি তাঁর ক্বওমকে তেমন ভয় না করলেও মাতাকে প্রচণ্ড ভয় করতেন। এরপর থেকে তিনি চুপিচুপি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গমন করতেন ও দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। একদা গোপনে তিনি ‘দারুল আরকামে’ প্রবেশ করছেন, এমতাবস্থায় ওছমান বিন তালহা তাকে দেখে ফেলে। অন্য একদিন তিনি ছাহাবীদের সাথে ছালাত আদায় করছিলেন, সেদিনও ওছমানের চোখে পড়ে যায়। সুতরাং বাতাসের ন্যায় খবরটি মক্কার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মায়ের কানেও পৌঁছায়। তাঁর মাতা যখন একথা শ্রবণ করল, তখন সে অত্যন্ত রাগান্বিত হল। এমনটি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় ও নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে *(আর-রাহীকুল মাখতূম, ৬৫)*। এভাবে নির্যাতনের স্টীমরোলার চালিয়ে যখন তাকে হক্বের পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরানোর সম্ভাবনা দেখতে পেল না, তখন তারা তাকে বন্দী করে। শুধু একটি কালেমা তথা ‘আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’ এতটুকু মেনে নেওয়ার কারণে মক্কার সবচেয়ে সুখী মানুষটি সবচেয়ে দুঃখী মানুষে পরিণত হলেন। তবুও তিনি হক্বের পথে আমৃত্যু অটল ও অবিচল ছিলেন *(সিরাতুন নববী ৪/৬৯)*।

আবিসিনিয়ায় হিজরত :

মুছ‘আব (রাঃ) বন্দী অবস্থায় অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। কারা জীবনের কষ্ট তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না। তিনি একদিন খবর পেলেন যে, কিছু মুসলিম হাবশায় হিজরত করবেন। তাই তিনি বন্দিত্বের অবসান ঘটিয়ে বন্দীকারী সকল মানুষের চোখে ধুলা দিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন *(রিজালুন হাওলার রাসূল ১/২)*।

আবিসিনিয়ায় অবসস্থানকালে হিজরতকারী মুসলিমরা এক মিথ্যা সংবাদ পেলেন যে, মক্কার কুরাইশ নেতারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। বর্তমানে মক্কার অবস্থা বেশ ভাল। তাই তারা জন্মভূমি মক্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে হাবশা ত্যাগ করেন। মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ)ও তাদের সঙ্গে ছিলেন। মক্কা থেকে একদিনের দূরুত্বে অবস্থানকালে তারা প্রকৃত খবর জানতে পারের। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে তাদের কিছু সংখ্যক ছাহাবী আবারও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সঙ্গে মুছ‘আব (রাঃ) পুনরায় হিজরত করেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, ১১১-১১২; রিজালুন হাওলার রাসূল ১/২)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর দূত ও সফল দাঈ :

৬২১ খৃষ্টাব্দে রাসূল (ছাঃ) মদীনা থেকে আগত ১৩ জন আনছারদের নিকট থেকে বায়‘আত গ্রহণের পর মুছ‘আব বিন উমায়ের (রাঃ)-কে মদীনায় ১ম রাষ্ট্রদূত তথা মদীনাবাসীদের জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেন। যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত প্রদানই ছিল তাকে প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্য।

মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) মদীনায় পৌঁছে আস'আদ বিন যুরারা (রাঃ)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। এরপর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তারা উভয়ে মদীনাবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এ সময় তিনি মুক্বরিয়ূ তথা ক্বারী উপাধি লাভ করেন। দ্বীনের তাবলীগের ক্ষেত্রে তার ব্যাপক সফলতা রয়েছে। আস'আদ বিন যুরারা (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে একদিন বনী আব্দুল আশহাল এবং বনী জা'ফরের মহল্লায় যান। সেখানে বনী জা'ফরের একটি বাগানে 'মারক' নামক একটি জলাশয়ের কিনারে বসেন। তাদের নিকটে কয়েকজন মুসলিমও সমবেত হন। বনী আশহাল গোত্রের নেতা ছিলেন সা'দ বিন মা'আয ও উছায়েদ ইবনে খোযায়ের। তারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। তারা নবাগত মুসলিমদের আগমনের খবর পেলেন। সা'দ অপর সর্দার উছায়েদ ইবনে খোযায়েরকে বললেন, তুমি যাও, দেখে এসো ব্যাপারটা কী?। ওদের বলবে যে, তোমরা কী আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে চাও। তাদের ধমক দিবে ও আমাদের মহল্লায় আসতে নিষেধ করবে। আস'আদ বিন যুরারা আমার খালাতো ভাই। এ কারণেই আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি। অন্যথা আমি নিজেই সেখানে যেতাম।

উছায়েদ তার বর্শা নিয়ে তাদের কাছে গেলেন। আস'আদ (রাঃ) তাকে আসতে দেখে মুছ'আব (রাঃ)-কে বললেন, ক্বওমের একজন সর্দার আপনার কাছে আসছেন। তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করুন। উছায়েদ পৌঁছেই ক্ষেপে গেলেন এবং বললেন, আপনারা কেন আমাদের এলাকায় এসেছেন? আপনারা কী আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে চান? প্রাণের মায়া থাকলে কেটে পড়ুন। মুছ'আব (রাঃ) বললেন, একটু বসুন। আমাদের কিছু কথা শুনুন। পসন্দ হলে গ্রহণ করবেন, না হলে গ্রহণ করবেন না। উছায়েদ বললেন, ঠিক আছে, বলুন। তারপর তিনি তার বর্শা মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। মুছ'আব (রাঃ) ইসলামের কথা বলতে শুরু করলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করলেন। সবকথা শুনে উছায়েদ বললেন, এ তো খুব চমৎকার বাণী। আপনারা মানুষকে কিভাবে ইসলামে দীক্ষিত করেন? মুছ'আব (রাঃ) বললেন, আপনাকে গোসল করে পবিত্র কাপড় পরিধান করতে হবে। এরপর কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে হবে এবং দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করতে হবে। উছায়েদ সব কাজ সম্পাদন করলেন এবং বললেন, আমাদের গোত্রে আরেকজন প্রভাবশালী নেতা আছেন। তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে পিছনে কেউ বাকী থাকবে না। আমি তাকে এখনই আপনাদের নিকটে পাঠাচ্ছি।

এরপর উছায়েদ (রাঃ) বর্শা নিয়ে সা'দ বিন মা'আযের কাছে গেলেন। সা'দ উছায়েদকে দেখে বললেন, এই লোকটি যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। তাই উছায়েদ (রাঃ)-কে সা'দ বললেন, তুমি কি করেছ? উছায়েদ (রাঃ) বললেন, আমি তাদের সাথে কথা বলে আপত্তিকর কিছু পাইনি। তবে আমি তাদের নিষেধ করেছি। তারা বলেছেন, আপনারা যা চান আমরা তাই করব। আমি শুনেছি, বানু হারেছা গোত্রের লোকেরা আস'আদকে হত্যা করতে চায়। কারণ সে আপনার খালাতো ভাই। ওরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করতে চায়। এ কথা শুনামাত্র সা'দ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বর্শা নিয়ে ওদের নিকটে পৌঁছলেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে দেখলেন, দুজনই নিশ্চিন্তে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, উছায়েদ চেয়েছে যে, আমি দুজন আগন্তুকের সাথে কথা বলি। সা'দ তাদের সামনে গিয়ে রুক্ষ ভাষায় বললেন, তোমরা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে চাও? এরপর আস'আদকে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম হে আবু আনাস! তোমার ও আমার মধ্যে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকত, তাহলে তুমি এ কাজ করতে পারতে না। আমাদের এলাকায় এসে তোমরা এমন কাজ করছ, যা আমরা পসন্দ করি না। আস'আদ বিন যুরারা (রাঃ) মুছ'আব (রাঃ)-কে আগেই বলেছিলেন যে, আপনার কাছে এমন একজন লোক আসছেন, যিনি তার গোত্রের প্রভাবশালী নেতা। তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে কেউই তার পিছনে বাকী থাকবে না। এ কারণে মুছ'আব (রাঃ) সা'দ (রাঃ)-কে বললেন, আপনি বসুন, আমার কিছু কথা শুনুন। মনে লাগলে শুনবেন আর না হলে শুনবেন না, চলে যাবেন। সা'দ বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে বলুন। একথা বলে তিনিও বর্শা মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। মুছ'আব (রাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করলেন। সা'দ বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণের পর কী কর? মুছ'আব (রাঃ) বললেন, আপনি গোসল করুন। এরপর পবিত্র কপড় পরিধান করুন। তারপর দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করুন। অতঃপর সা'দ ইবনে মা'আয গোসল করলেন, কাপড় পরিধান করলেন এবং দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সা'দ (রাঃ) তাঁর নিজ গোত্রের নিকট ফিরে গেলেন। লোকেরা বলল, আপনি ভিন্ন চেহারায় ফিরে এসেছেন মনে হচ্ছে! সা'দ (রাঃ) বললেন, তোমরা আমাকে কেমন মনে কর হে বনী আব্দুল আশহাল! সকলে সমস্বরে বলে উঠল, আপনি আমাদের কুশাগ্রবুদ্ধি ও জনপ্রিয় নেতা। বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনায় সকলের শ্রেষ্ঠ। সা'দ বললেন, তাহলে শোনো, তোমরা যতক্ষণ আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপরে ঈমান না আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমার কথা বলা হারাম। বিকাল পর্যন্ত উসায়রিম নামক জনৈক ব্যক্তি ব্যতীত গোত্রের সকলে ইসলাম গ্রহণ করল। তিনিও উহুদ যুদ্ধের দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উক্ত যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, সে সল্প আমল করে অনেক বেশি প্রতিদান পেয়েছে *(ইবনে হিশাম ১/৪৩৫ পৃঃ)*।

এভাবে মুছ'আব (রাঃ)-এর দাওয়াতে আনছারদের প্রতিটি পরিবার থেকেই কয়েকজন করে ইসলাম কবুল করেন। পরবর্তী হজ্জ মৌসুম আসার পূর্বেই তিনি এ সুসংবাদ নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে হাজির হন। তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে মদীনার সামগ্রিক অবস্থার বিবরণ দেন। পরবর্তীতে তিনি স্বস্ত্রীক মুহাজিরদের সাথে আবার মদীনাতে হিজরত করেন। এবার তিনি ও তাঁর স্ত্রী হুমনা বিনতু জাহাস সা'দ বিন মা'আযের বাড়িতে অবস্থান করেন

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ :

বদর যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীদের মধ্যে মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) ছিলেন অন্যতম। বদর যুদ্ধের সেনা বিন্যাস ছিল এক দল আনছার অপর দল মুহাজির। মুহাজিরদের পতাকা ছিল আলী ইবনু আবু ত্বালেবের হাতে। পড়্যান্তরে আনছারদের পতাকা ছিল সা'দ বিন মা'আযের হাতে। আর সম্মিলিত মুসলিম বাহিনীর পতাকা অর্পণ করা হয় মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)-এর হাতে *(আর-রাহীকুল মাখতূম, ২১২)*।

যুদ্ধ শেষে মুছ'আব তাঁর ভাই আবু আযীযের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু আযীয মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সেসময় আনছারী ছাহাবীর হাত কেটে গেল। মুছ'আব (রাঃ) বললেন, এই লোকটির মাধ্যমে হাত শক্ত করুন। তার মাতা বড় ধনী। তিনি সম্ভবত তোমাকে মোটা অঙ্কে মুক্তিপণ দিবেন। তার ভাই আবু আযীয তাকে বললেন, ভাইরে; আমার ব্যাপারে তোমার এটাই অছিয়ত। মুছ'আব (রাঃ) বললেন, তুমি নাও এই আনছারী আমার ভাই *(রওযুল আনফ ৩/৯৫)*। এভাবেই মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ) ছিলেন ঈমানের প্রতি অটল ও অবিচল। স্বজনপ্রীতি ও স্বদেশের মায়া তার মনকে কখনও হক্ব হতে বিন্দু মাত্র টলাতে পারেনি।

উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও শাহাদত বরণ :

রাসূল (ছাঃ) কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সমগ্র সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। যেমন- (ক) মুহাজির বাহিনী (খ) আনছারদের খাজরাজ বাহিনী (গ) আওস বাহিনী। মুহাজিরদের পতাকা মুছ'আবকে প্রদান করা হয়। মুসলিমরা অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করছিলেন। এক সময় তারা বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেল। কিন্তু তীরন্দাজদের মারাত্মক ভুলের কারণে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। মুসলমানরা চরম বিপদের সম্মুখীন হলেন। কাফেররা উম্মাদ হয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার জন্য তার দিকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে লাগল। এক পর্যায়ে তারা তাকে ঘিরে ফেলল। মুছ'আব পরিস্থিতির ভয়বহতা উপলব্ধি করলেন এবং তা প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এসময় তিনি ইবনু কোম্মার আঘাত প্রতিরোধ করছিলেন। দুর্বৃত্ত ইবনু কুম্মা প্রথমে তার ডান হাতে আঘাত করলে তা কেটে গেল। তখন তিনি তার বাম হাতে মুসলিম বাহিনীর পতাকা উত্তোলন করলেন। কিন্তু শত্রুর হামলায় তার বাম হাতও কেটে গেল। তখন তিনি পতাকাকে বাহুদ্বয়ের মাধ্যমে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর সেই অবস্থাতেই তিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। তাঁর হত্যাকারী ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে কুম্মা। এই দুর্বৃত্ত মুছ'আবকে রাসূল (ছাঃ) মনে করেছিল। কেননা মুছ'আবের চেহারা রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারার সাথে কিছুটা মিল ছিল। মুছ'আবকে হত্যা করার পর ইবনু কুম্মা কাফেরদের মধ্যে গিয়ে চিৎকার দিয়ে বলেছিল, আমি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যা করেছি *(ইবনে হিশাম ২/৭৩-৭৪ পৃঃ)*। অথচ সে মুছ'আব (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। তাঁর মৃত্যুর খবর মক্কার অলিতে-গলিতে প্রচার হতে থাকল। এক সময় তার স্ত্রী ওমনা বিনতু জাহসের নিকট পৌঁছল। এ খবর শুনে তার স্ত্রী হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, প্রত্যেক নারীর স্বামীই তার কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৬৫)*।

দাফন ও কাফন :

মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)-এর দাফন-কাফনের ঘটনা অত্যন্ত করুণ ও বেদনাদায়ক। যা হাদীছে অত্যন্ত আবেগময় অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। আমাদের এ কাজের প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আমাদের মধ্যে যারা একাজের প্রতিদান মোটেও না নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজন মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)। উহুদ যুদ্ধের দিনে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাকে দাফন দেওয়ার জন্য এক প্রস্থ চাদর ছাড়া কিছুই পাওয়া যাচ্ছিল না। যা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। তা দিয়ে তার মাথা ঢাকলে পা ঢাকে না এবং পা ঢাকলে মাথা ঢাকে না। অবশেষে রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, চাদর দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও, আর পা 'ইযখির' ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও *(বুখারী হা/৩৮৯৭, 'নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের মদীনায় হিজরাত' অনুচ্ছেদ-৪৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৭০১৯; বায়হাক্বী-শু'আবুল ঈমান হা/১০৪০২; মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/৬১৯৫)*।

জীবনী থেকে শিক্ষা :

(ক) হক্বের পথে দৃঢ় থাকতে গেলে পারিবারিক বাধা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বাধাকে নির্ভয়, সাহস ও কৌশলে মোকাবেলা করাই প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

(খ) মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার সময় তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলতে হবে এবং তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে।

(গ) ঈমানের তাকীদে প্রয়োজনে হিজরত করতে হবে ।

(ঘ) দাওয়াতের ক্ষেত্রে সফলতার জন্য খালেছ নিয়ত থাকা আবশ্যক।

(ঙ) পিতা-মাতার আদেশ মান্য করা ফরয। কিন্তু সে আদেশ যদি কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী হয়, তাহলে তা পরিত্যাগ করাও আবশ্যক।

উপসংহার :

ধৈর্য ও অটল বিশ্বাসের প্রাণপুরুষ ছিলেন মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও হিকমতপূর্ণ কার্যাবলী সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম ও অনাগত ভবিষ্যতের মুসলিম যুবকদের জন্য বিশেষ করে আহলেহাদীছ নওজোয়ানদের জন্য তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণীয় এবং তাদের সংগ্রামী জীবনে নিত্য প্রেরণা যোগাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

[লেখক : আলিম প্রথম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী]

দুর্গশহর কোয়েটায়..

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের নানা শহর-বন্দর পাড়ি দিয়ে প্রায় ২ দিন টানা জার্নির পর বালুচিস্তানের রাজধানী দুর্গ শহর কোয়েটায় পা রেখেছি ১৩ অক্টোবর'১৩ বুধবার বিকালে। ইসলামাবাদের হিসাবে সূর্য তখন পাটে যায় যায় হওয়ার কথা। তবে কোয়েটায় তখনও ঘন্টাখানিক সময় বাকি। বালুচ সহযাত্রীদের বিদায় জানিয়ে আমি আর শাহীন (আমাদের আত্মীয় ও সমবয়সী বন্ধু, কোয়েটায় বোলান মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা শেষ করে এখন চাকুরীরত) ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। রেলস্টেশনের অভ্যন্তরে না ঢুকে উল্টো পথে কয়েক সারি রেললাইন অতিক্রম করে এগুলাম স্টেশন রোডের দিকে। রেললাইনের উপর কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতবর্ষের পুরানো পরিত্যক্ত যাত্রীবাহী ট্রেনের সারি। সম্পূর্ণ কাঠের ফ্রেমের বগিগুলো। একটার ভিতরে ঢুকে মনে হল হঠাৎই যেন টাইম মেশিনে চড়ে সেই মেঘের মত ধোঁয়া উড়িয়ে চলা প্রাচীন স্টীম ইঞ্জিনের যাত্রী হয়ে গেছি।

স্টেশন রোডে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর লোকাল ট্রান্সপোর্টের একটি বাস আসতে দেখা গেল। এখানকার লোকাল ট্রান্সপোর্ট বলতে সিএনজি (এদের ভাষায় রিকশা)। আর ২০ মিনিট পর পর একটি মুড়ির টিন মার্কা বাস পর্যন্তই সীমিত। এর বাইরে বাকি সব প্রাইভেট গাড়ি কিংবা মটর সাইকেল। দু'চারটা গাধা-খচ্চর টানা কার্ট ছাড়া ইঞ্জিনবিহীন কোন যানবাহন রাস্তায় নেই। বাস না থামতেই বিচিত্র সুরেলা কণ্ঠে হেলপারের চিৎকার বারূ...রী.., বারূ...রী..। তারপর বাসে উঠার জন্য সামনের দরজার পাদানিতে পা রাখতেই লক্ষ্য করলাম সামনের অর্ধেকটা অংশ পুরোপুরি মহিলাদের দখলে। মাঝখান থেকে টপ-টু-বটম ব্লক করা, তারপর পিছনের অংশটা পুরুষদের। অগত্যা নেমে এসে পিছনের দরজা দিয়ে উঠলাম। বাসে ভীড় না থাকলেও কোন সীট ফাঁকা নেই। ভাবছি দাঁড়িয়েই যেতে হবে। কিন্তু একদম সামনের সীটে বসা ৯-১০ বছরের ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বসার জন্য ইশারা করল। শাহীন জানালো, এখানে বড়দের উপস্থিতিতে ছোটরা সীটে বসে না। এটা কেবল ভদ্রতা নয়, এখানকার অবশ্য পালনীয় রীতি। শুরুতেই এই নতুন দু'টো ব্যাপার দেখে বেশ ভাল লাগল।

শাহীনের ভাষ্যমতে, এই শহরকে বহিরাগতরা 'তালেবান শহর' বলে। এখানে কোথাও কোন বেপর্দা মহিলা দেখা যায় না। শার্ট-প্যান্ট-স্যুট পরিহিত লোকেরও দেখা মেলা ভার। কোলের শিশু থেকে শুরু করে শতবর্ষী বৃদ্ধ, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুচী পর্যন্ত সবারই ঐ একই পোষাক। এমনকি ট্রাকের তলায় শুয়ে কালি মেখে ভুত হয়ে যে লোকটি সার্ভিসিং-এর কাজ করছে, তারও গায়ে সেই পোষাক অর্থাৎ ৩-৪ গজী চওড়া কুচিদার পাঠানী ঢোলা পাজামা আর কাবুলী কামীজ (আমাদের ব্যবহৃত শব্দ 'পাঞ্জাবী' এখানে কামীজ, কোর্তা বা স্যুট নামে ব্যবহৃত হয়। পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসীরা এই জাতীয় ড্রেস পরে বলেই আমাদের কাছে এর নাম 'পাঞ্জাবী', কিন্তু যেই নিয়তে আমরা 'পাঞ্জাবী' উচ্চারণ করি, তাতে 'পাঞ্জাবে'র কথা ঘুণাক্ষরেও মাথায় আসে না। নইলে আমাদের বাহাদুর দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদরা শব্দ-ব্যবচ্ছেদ করে নিশ্চিতভাবে আমাদের এই প্রিয় পোষাক থেকে 'পাঞ্জাব' নামক 'পাকিস্তানী ভুত' তাড়াতে আন্তরিক হতেন)। এটাই এদের জাতীয় পোষাক। পার্থক্য একটাই, মাদরাসা-মসজিদ সংশ্লিষ্টরা পরে সাধারণ কলারের পাঞ্জাবী আর অন্যরা শার্ট কলারের। প্রত্যেকের মাথায় রুমাল, পাগড়ী বা টুপি জাতীয় মস্তকাবরণ কিছু একটা সাধারণতঃ থাকেই। বয়স্ক বালুচী পাঠানদের কাঁধে থাকে বিশেষ চাদর আর হাতে তাসবীহ। সময়-অসময় নেই একটু ফাঁক পেলেই এনাদের হাতের তাসবীহ দানাগুলো সচল হয়ে ওঠে। তবে কাজটি চলে এমন সুতীব্র গতিতে যে সেটা তাসবীহ গণনা নাকি অবসর কাটানো ক্রীড়া তা ঠাওর করতে বেগ পোহাতে হয়। মহিলাদের সম্মানের দিকটা এরা সবসময় খেয়াল রাখে। এজন্য টাউন সার্ভিসের প্রতিটি বাসই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পার্টিশন দিয়ে দুইভাগে ভাগ করা। এমন কোন খাবার হোটেল নেই, যেখানে মহিলাদের বসার জন্য পর্দাটানা পৃথক ব্যবস্থা নেই। মোটামুটি ধর্মীয় আবহ লক্ষ্য করা যায় সর্বত্রই। এদের জাতিসত্ত্বার সাথে ধর্মীয় কালচারটা যে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এদের ছালাতের অভ্যাসটাও বেশ প্রশংসনীয়। আসার সময় ট্রেনে দেখছিলাম আমাদের বগির বালুচ ছেলেদের বেশ কয়েকজনকে স্টেশনে ট্রেন থামলে প্লাটফর্মেই চাদর পেতে ছালাতে দাঁড়াতে। যদিও বিদ্যুৎগতির সে ছালাতে খুশু-খুযু'র অস্তিত্ব টের পাওয়া খুব শক্ত। আবার শাহীনের দারস্থ হলাম। ও বলল, ধর্মটা আসলে এদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের আচরিত সামাজিক কালচার। ধর্মীয় আচারাদি পালনে এরা অনেক অগ্রগামী বটে, তবে প্রকৃত সচেতনতার সাথে ধর্ম পালন করে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ধরাধামের আর সব জায়গার মত এখানেও দুষ্কর।

২০ মিনিট পর শহরের দক্ষিণে বারূরী রোডস্থ বোলান মেডিকেল কলেজ (বিএমসি) হাসপাতালের সামনে এসে বাস দাঁড়িয়ে গেল। মেডিকেল কলেজ থেকে ৫ মিনিটের পায়দল দূরত্বে শাহীনদের হোস্টেল। ফ্রন্টিয়ার করপ্স (এফসি)-এর নিরাপত্তা চৌকিটি পেরিয়ে দোতলা হোস্টেলটিতে ঢুকলাম। বিএমসির বাঙালী স্টুডেন্ট আব্দুল আযীয (ফেনী) আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। গোসল সেরে খেতে বসলাম। খিচুড়ি আর ডিম ভাজার আয়োজন করেছে আব্দুল আযীয। মাত্র দুই সপ্তাহ আগে পাকিস্তান এসেছি, অথচ মনে হল অনন্তকাল পর আজ বাঙালী খানা খাচ্ছি। খুব তৃপ্তি ভরে খেলাম। একটানা রুটি, আর তেলে ভাজা চাউল (ফ্রাইড রাইস) খেয়ে এ ক'দিনেই হাপিয়ে উঠেছি (পাকিস্তানীরা ভাতকে বলে চাউল, প্রথম প্রথম হোটেলে ঢুকে 'ভাতের' পরিবর্তে 'চাউল' চাওয়াটা ছিল বড় অস্বস্তির)।

হোস্টেলটি বিএমসির ফরেনার স্টুডেন্টদের বলে সুযোগ-সুবিধা বেশ ভালই। শাহিনের সিঙ্গেল রুমটিতে এটাচড বাথসহ রুম হিটার ও ফ্রীজের ব্যবস্থা রয়েছে। রুমের আসবাবপত্র, কিচেন সামগ্রী, এমনকি লাইট বাল্বগুলো পর্যন্ত বিএমসি থেকে সরবরাহ করা হয়। রুম ভাড়া দিতে হয় বার্ষিক মাত্র ৫০০০ রুপী। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকাসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শতাধিক ফরেনার

Contents

ছাত্র এখানে পড়াশোনা করে। হোস্টেল মসজিদে ছালাত পড়তে গিয়ে মনে হল যেন আহলেহাদীছ মসজিদ। আরব আর আফ্রিকানরা সবাই সালাফী আক্বীদা-আমলসম্পন্ন। ফিলিস্তীনের গাজা থেকে আসা মুহাম্মাদের সাথে পরিচিত হতে গিয়ে সে নিজেকে সরাসরি আহলেহাদীছ বলেই পরিচয় দিল।

পরদিন সকালে কোয়েটার সুপ্রসিদ্ধ লিয়াকত বাজার এবং জিন্নাহ বাজার ঘুরে আসলাম। নানা পদের প্রচুর তাজা এবং শুকনা ফলমূলে ভরপুর বিরাট কাঁচাবাজারটি। সদ্য পেড়ে আনা তাজা আপেলের স্বাদের সাথে আমাদের চিরচেনা আপেলের যে কত তফাৎ তা এক টুকরা গালে নিতেই বোঝা গেল। সেই সাথে তাজা আঙ্গুর আর কমলার পসরা। সজির বাজারে টাটকা শাক-সজি দেখে টাশকি খাওয়ার দশা। এই মরুভূমিতে এত সজির সমারোহ দেখতে পাব কল্পনাই করিনি।

পরে জানতে পারলাম, কোয়েটা শহর নাকি সারা পাকিস্তানেই ফলমূলের জন্য বিখ্যাত। এ জন্য এর আরেক নাম 'ফ্রুট গার্ডেন অফ পাকিস্তান' বা পাকিস্তানের ফলের বাগান। কোয়েটা শহরের ২৫ কি.মি. উত্তরের 'উরাক' ভ্যালিকে বলা হয় 'ছামারিস্তান' বা ফলের দেশ। এখানে মাইলের পর মাইল আপেল গাছের সারি চাঁপাইয়ের আম বাগানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ উচ্চতার শহর (১৬৮০ মিটার বা ৫৫০০ ফুট) হওয়ার কারণে এখানে পানি সংকট অত্যাধিক। মটর দিয়ে পানি তুলতে মাটির নিচে কমপক্ষে ৩০০-৩৫০ ফুট গভীর পাইপ বসাতে হয়। শহরের পার্শ্বস্থ এলাকায় স্যুয়ারেজের পানি ব্যবহৃত হয় চাষাবাদে। এর মধ্য দিয়েই নির্বিঘ্নে চাষাবাদ চলছে। শাক-সজির দাম যে পাকিস্তানের অন্যান্য শহরের তুলনায় বেশী, তাও নয়।

শাহীনের এক আফগানী বন্ধুর সৌজন্যে দুপুরের খাবার খেলাম লিয়াকত বাজারে নেহারীর জন্য সুপ্রসিদ্ধ হোটেল মাশহাদে। পাকিস্তানে এসে এই প্রথম স্থানীয় কোন খাবার খেলাম খুব তৃপ্তির সাথে। আফগানী রুটির সাথে বিরাট সাইজের পায়া (গরু বা মহিষ), যা একার পক্ষে খেয়ে শেষ করা কঠিন। বালুচ ও পশতুনরা পায়া বা নেহারীর চরম ভক্ত। গোশতের বাজারে ঢুকলে প্রথমেই দেখা যাবে থরে থরে সাজিয়ে রাখা গরু-মহিষ-ছাগল-দুম্বার পা। আরেকটা জিনিস হল কাঠি কাবাব। আমাদের শিক কাবাবের মতই অনেকটা। তবে গোশতের টুকরাগুলো বড় বড়। প্রায় রাস্তার মোড়ে এই কাবাবের অস্থায়ী দোকান দেখা যায়। এছাড়া সাজ্জি কাবাব (মুরগি বা ভেড়ার রান দিয়ে তৈরী বিশেষ রোস্ট), লান্ধি কাবাব (ভেড়ার পূর্ণ রানের রোস্ট), খাদি কাবাব ইত্যাদি এখানে সুপ্রসিদ্ধ। পাকিস্তানের আর সব প্রদেশের মত এদেরও প্রধান খাবার রুটি। এখানে প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় কিছু না হলেও অন্তত একটা রুটির দোকান থাকবেই। নিতান্ত বিপদে না পড়লে এই রুটি বাড়িতে তৈরী করার ঝক্কিতে যেতে চায় না কোন গৃহকর্তী। তাই দোকানের রুটিই এদের ভরসা।

খাওয়া শেষে কান্দাহারের বাসিন্দা ঐ আফগানীকে জিজ্ঞাসা করলাম, চামান তথা কান্দাহার বর্ডার ক্রসিং-এ যেতে চাই, কোন সমস্যা আছে কিনা। শুনেই আঁতকে উঠলেন লোকটা। বলল, 'কোয়েটা পর্যন্ত এসেছেন এটাই অনেক বেশী হয়ে গেছে। আর অমুখে যাওয়ার চিন্তা ভুলেও করবেন না। ফরেনারদের কিডন্যাপ করে মুক্তিপণ আদায় করা আফগান সীমান্তবর্তী এলাকার বিদ্রোহী বালুচ যোদ্ধাদের উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। আমরা আফগানীরা পর্যন্ত প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করি'। কোয়েটা থেকে বাসে বা ট্রেনে যাতায়াত ব্যবস্থা খুব ভাল চামান বর্ডার পর্যন্ত। ওপারে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশ। ১২৫ কিঃমিঃ দূরত্বের এই পথে যেতে প্রায় দু'ঘন্টা সময় লাগে। কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে মানুষজনের ক্রমাগত ভীতি প্রদর্শনে সে ইচ্ছাকে ছাইচাপা দিতে হল। একই কারণে কোয়েটার প্রধান পর্যটনস্থলগুলো অর্থাৎ উরাক ভ্যালি, পিশিন ভ্যালি, হান্না লেক, মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর অবকাশ কেন্দ্র 'যিয়ারাত' একে একে সবই সফর তালিকা থেকে বাদ দিতে হল। একে তো ঈদের মৌসুম, অন্যদিকে জঙ্গি হামলার ভয়। ফলে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরায় বাঁধ সেঁধেছে নানা বিধি-নিষেধ আর ভয়-ভীতির শক্ত আবরণ। বড় দুঃসময়েই যেন অনাহুতের মত এসে বসেছি কোয়েটায়। অবশ্য মৌলিকভাবে যা দেখার ছিল তা লাহোর থেকে কোয়েটার পথে দীর্ঘ ২৪ ঘন্টার ট্রেন যাত্রায় দেখা হয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানের আয়তনে সর্ববৃহৎ প্রদেশ এই বালুচিস্তান ইতিহাসের বহু চড়াই-উৎরাইয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সিন্ধু সভ্যতারও বহু পূর্বে ইতিহাসের পাতায় এর নাম পাওয়া যায়। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে খলীফা ওমর (রাঃ)-এর আমলে সুহায়েল বিন আদী (রাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী পশ্চিম বালুচিস্তান জয় করার মাধ্যমে এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম ইসলামের প্রবেশ ঘটে। তারপর ওছমান (রাঃ)-এর আমলে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী সমগ্র বালুচিস্তান জয় করে এবং এটি খোলাফায়ে রাশেদীনের আওতাভুক্ত রাজ্যে পরিণত হয়। এই অঞ্চলটি আরবদের কাছে অধিক পরিচিত ছিল 'তুরান' নামে, যার রাজধানী ছিল কুছদার (যা এখন কোয়েটা থেকে প্রায় ৩০০ কিঃমিঃ পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি যেলা শহর, পশতু উচ্চারণ অবশ্য 'কুছদার' নয়, 'খুযদার')। বর্তমানে পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের ৪৪ শতাংশই গঠন করেছে এই প্রদেশ। তবে জনবসতি খুবই কম। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ বাস করে এখানে। তার কারণ এর পুরোটাই পর্বতময় কিংবা পাথুরে মালভূমি, যার মধ্য দিয়ে চলে গেছে মাইলের পর মাইল বালু-পাথরে ভরা ধু ধু মরুভূমি আর শুষ্ক অনাবাদি সমভূমি। সারাবছর বৃষ্টিপাত নেই বললেই চলে। ফলে সাধারণত কোন ফসলাদিও হয় না। কোন উঁচু গাছ-পালাও নেই। আবার শীতকালে এমন ঠাণ্ডা পড়ে যে তুষারপাত হয়। এই প্রদেশেরই বর্তমান রাজধানী দুর্গ শহর কোয়েটা। বালুচিস্তানের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ তথা প্রায় ২০ লক্ষ অধিবাসী বসবাস করে এ শহরে। চতুর্দিক থেকে চিল্টান, টাকাটু, যারগুণ ও মারদার নামক চারটি পর্বত একে প্রবল প্রতাপ নিয়ে ঘিরে রেখেছে দুর্গের মত। এই কারণেই সম্ভবত এর নাম 'কোয়েটা', পশতু ভাষায় যার অর্থ 'দুর্গ'। পাহাড়গুলোর সবগুলোরই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ১০,০০০ ফুটের উপরে। পূর্বদিকের যারগুণ পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির উচ্চতা ৩৫৭৮ মিটার বা ১১,৭৩৮ ফুট, যা সমগ্র বালুচিস্তানেরই উচ্চতম শৃঙ্গ। এই পাহাড়গুলোর ঢালের উপর গড়ে উঠেছে শহরটি আর ক্রমশ ঢালু হয়ে কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়েছে। ফলে শহরের যে কোন প্রান্তে দাঁড়ালে স্টেডিয়ামের গ্যালারী থেকে দৃশ্যমান ফুটবল মাঠের মত পুরো শহরটা দৃষ্টির সামনে অবারিত হয়ে ধরা পড়ে। বিরাট শহরটি তখন মনে হতে থাকে অতিশয় ক্ষুদ্র, হাতের মুঠোয় নিয়ে ধরার মত বস্তু। আর রাতের বেলার সে অদ্ভুত ঝলমলে সৌন্দর্যের কথা তো বলাই বাহুল্য। অবাক করা ব্যাপার হল, এখানে খোলা ছাদের উপর ওঠাকে সামাজিকভাবে খুব খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। কারণ তাতে প্রতিবেশীদের প্রাইভেসী নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। বিষয়টি নাকি এতটাই স্পর্শকাতর যে, কখনও এর ব্যত্যয় ঘটলে এমনকি

গোলাগুলি পর্যন্ত লেগে যায়। ফলে উন্মুক্ত ছাদের উপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির মনোহর শোভা উপভোগের সুযোগ এখানে নেই। বার দুয়েক হোস্টেলের ছাদে উঠার চেষ্টা করতে গিয়ে যখন জানলাম অভিনব বিষয়টা, তখন মুখে শাপশাপান্ত করলেও মনে মনে তাদের আত্মমর্যাদাবোধের দিকটা প্রশংসা না করে পারলাম না। ১৬ অক্টোবর'১৩ বুধবার ছিল ঈদুল আযহা। ঈদ উপলক্ষে গরু বা উট কুরবানী করার তেমন চল নেই এখানে। কুরবানী হিসাবে দুম্বাই এদের প্রথম পসন্দের। তাই ঈদের আগের দিন হোস্টেলে ফেরার সময় বিভিন্ন রাস্তায় দেখলাম কেবল দুম্বা আর ছাগলের সারি। তবে বাংলাদেশের মত উৎসবমুখর আমেজ নেই ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে। তাছাড়া অধিকাংশ শহরবাসী ক্রেতারা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে রাখালদের কাছ থেকে কুরবানীর পশু কিনে নিয়ে আসে। ফলে আমাদের দেশের মধ্যে ঘটা করে আলাদা 'বিরাট গরু-ছাগলের হাট' বসানোর দরকারও হয় না।

পরদিন ঈদের ছালাত আহলেহাদীছ জামা'আতে পড়ার সুযোগ পেয়ে মনে মনে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেছিলাম খুবই। এই বিচ্ছিন্ন জগতে এসে আহলেহাদীছ আক্বীদার দেখা পাব, এটা সত্যিই ভাবনার বাইরে ছিল। জামা'আতে উপস্থিত মুছল্লী সংখ্যা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। পরে আব্দুল বাছীর ভাইয়ের কাছে যা শুনলাম, তাতে শহরে আহলেহাদীছের সংখ্যা নিতান্ত কম তো নয়ই, বরং শহরের অভ্যন্তরভাগে এবং শহরতলীর বিভিন্ন এলাকা মিলে এই কোয়েটায় ছোট-বড় প্রায় ২৫-৩০টি আহলেহাদীছ মসজিদ আছে। রয়েছে ৪/৫টি আহলেহাদীছ মাদরাসা এবং দু'টি আহলেহাদীছ সংগঠনের (মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ ও জামা'আতুত দাওয়াহ) সক্রিয় কার্যক্রম। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন একটি মসজিদ-মাদরাসা বা সাংগঠনিক অফিসে যাওয়ার সুযোগ করতে পারলাম না।

ঈদের দিনে অনেকটা সময় ধরে পাশ্ববর্তী পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এদের কুরবানী, খোলা মাঠে রঙ-বেরঙের পোষাকে শিশু-কিশোরদের খেলাধূলা, উট ও ঘোড়া বিচিত্র সাজে সাজিয়ে রাখালদের বিচরণ আর তাতে চড়ে বাচ্চাদের ঘুরে বেড়ানো, পশ্চিমের চিল্টান পাহাড়ের পাথুরে গাত্রে চড়ে কোয়েটা শহরকে মুঠোবন্দী করে দেখা সবকিছু বেশ উপভোগ করেছি। ভাল লেগেছে কোথাও উচ্চস্বরে গান-বাদ্য বাজানোর ব্যবস্থা না দেখে। যদিও এরা যে গান-বাজনার যথেষ্ট ভক্ত তা বোঝা যায় সিএনজি বা লোকাল গাড়িতে চড়লে।

যে এলাকায় ছিলাম সেখান থেকে 'হাজারা' টাউন শুরু হয়েছে। এরা মূলত মধ্য আফগানিস্তানের হাজারা সম্প্রদায়ভুক্ত শী'আ। বর্তমানে এদের বিরাট একটা অংশ আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে কোয়েটায় এসে বসবাস করছে। সংখ্যায় প্রায় ৭০ হাযারের মত। এদের বিরুদ্ধে প্রায়ই জঙ্গী হামলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে সুন্নীপন্থী জঙ্গী গ্রুপ লস্করই-জংভী এদেরকে কোয়েটা থেকে উৎখাতের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে আসছে। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী'১৩ এখানে এক পানির ট্যাংকিতে পেতে রাখা বোমার ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রায় দেড়'শ মানুষ নিহত হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল কয়েক শত। সেকারণে এই টাউনের প্রতিটি গলিতে দেখলাম ছোট ছোট ব্যারাক বানিয়ে নিরাপত্তা সংস্থা এফসি'র সশস্ত্র প্রহরা। এই ঈদের দিনেও এর কোন ব্যত্যয় নেই।

মটর সাইকেল এদের অতিপ্রিয় এবং অপরিহার্য বাহন। এখানকার প্রায় প্রতিটি বস্তিবাড়ীতে পর্যন্ত মটর সাইকেল শোভা পায়। রাখালেরা মরুভূমিতে দুম্বা চরাতে যায় মটরসাইকেলে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথরের মাঝে ফাঁক খুঁজে খুঁজে সর্পিল পথে মটর সাইকেল চালানোর সে দৃশ্য দেখে ছোটকালের সেই মটোরেসার গেমের রকি ট্র্যাক-এর কথা মনে পড়ে গেল। ৮-১০ বছরের ছোট্ট বাচ্চা-কাচ্চা যে দক্ষতার সাথে মটর সাইকেল চালায়, তা অবাক করার মত। ঈদের দিন বিকেল হতেই রাস্তায় রাস্তায় কুচিদার ঢোলা পায়জামা ফুলিয়ে বালুচ তরুণরা সাইলেন্সারহীন মটরসাইকেল চালিয়ে বেড়াচ্ছিল বিকট আওয়াজ তুলে। দৃশ্যটা বিরক্তিকর হলেও এক নতুন অভিজ্ঞতা ছিল বটে। রাতে প্রথমবারের মত কোন তাবলীগী মারকাযে গিয়ে বয়ান শোনা আর শাহী আয়োজনের খানাপিনায় অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতাটাও নেহায়েত মন্দ হয়নি।

ঈদের দু'দিন পর শাহিনের এক বন্ধু নাযির ভাইয়ের গাড়িতে আমরা গেলাম কোয়েটার এক বিস্ময়কর পাহাড়ী গুহা 'জাবালে নূরুল কুরআন'-এ। চিল্টান পর্বতশ্রেণীর একটি পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা অংশ জুড়ে মনুষ্য নির্মিত এই গুহায় সংরক্ষণ করা হয়েছে এখন পর্যন্ত ২ লক্ষেরও বেশী অব্যবহৃত, পরিত্যক্ত কুরআন মাজীদ। সমগ্র পাকিস্তান থেকে এই কমপ্লেক্সের কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত কুরআন সংগ্রহ করে থাকে এবং বস্তাবন্দী করে গুহায় সংরক্ষণ করে। এসব কুরআন পরিবহনের জন্য এদের নিজস্ব কয়েকটি গাড়িও আছে। ১৯৯২ সালে এই অভিনব কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরবর্তীতে সরকার পাহাড়ের এই অংশটি কমপ্লেক্সকে দান করে। অবশ্য সরকারী কোন সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানটি গ্রহণ করে না। কেবল মানুষের ব্যক্তিগত ডোনেশন দিয়ে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৯২ সালে জনৈক হাজী আল্লাহ নূর দাভী নামক এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে এই প্রকল্পটি শুরু করেন। পরে তাঁর এই অভিনব ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে অনেকেই সহায়তা করেন। সেই থেকে এই পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগে অব্যাহতভাবে টানেল খোঁড়ার কাজ চলছে। প্রায় ১৫/১৬টি টানেল লম্বালম্বি কিংবা আড়াআড়িভাবে বিভিন্ন দিকে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। তবে প্রতিটি টানেলই আবার একে অপরের সাথে সাব-টানেল দিয়ে সংযুক্ত। গোলকধাঁধায় যেন না পড়তে হয় এ জন্য দিকনির্দেশক সাইন দেয়া আছে। গুহা খুড়তে শাবল, গাইতি ছাড়া কোন মেশিনারিজ ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয় না। এজন্য গুহা গাত্র জুড়ে এবড়ো থেবড়ো পাথর-মাটি দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এটা প্রাকৃতিক গুহা নয়। এই গুহাগুলোতেই মানুষের হাটার জন্য পথ

রেখে বাকি অংশে অথবা সাব-টানেলগুলোতে প্লাস্টিকের বস্তায় বেঁধে হাযারো কুরআনের কপি স্তূপ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দর্শকদের সুবিধার জন্য ভিতরে বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিছু কিছু স্থানে ছালাতেরও জায়গা করে দেয়া আছে।

সন্দেহ নেই বহু মানুষ স্থানটিকে বিশেষ বরকতময় মনে করে নানা শিরক-বিদ‘আতে লিপ্ত হয়। অনেককেই দেখলাম এসব জায়গায় ছালাত আদায়সহ যিকির-আযকারে মশগুল থাকতে।

গুহার প্রধান গেটে ঢোকার মুখে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে বিভিন্ন যুগে প্রকাশিত নানা আকৃতির কুরআন। প্রাচীন আমলের প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীরও রাখা হয়েছে সেখানে। পয়সার আকৃতির অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি কুরআনও দেখলাম। কর্তৃপক্ষের সংগ্রহ তালিকায় একটি বাংলা অনুবাদ কুরআনের কথা লেখা ছিল। তবে অনেক খুঁজেও আমি শোকেসে পেলাম না।

বাইরে বের হয়ে দেখলাম একটি বিশাল গুদাম ঘরে সদ্য আগত কয়েকশ’ বস্তা কুরআন ভিতরে প্রবেশ করানোর অপেক্ষায় রাখা হয়েছে। তারপর মূল কমপ্লেক্স থেকে বের হয়ে পার্কিং লটে দাঁড়ালাম আমরা। মেইন রাস্তা থেকে পাহাড়ের উপর প্রায় ১০০ মিটার উঁচুতে এ স্থানটি। কোয়েটা শহরের বার্ড-ভিউটা এবার খুব চমৎকারভাবে নযরে আসল। বিস্তীর্ণ মরুভূমির বুকে বিশাল বিশাল স্মৃতিসৌধের মত পাহাড়গুলো সগৌরবে দণ্ডায়মান। আর তাদেরই কোলে পরম যত্নে কেউ যেন ছবির মত শহরটা আঁকিয়ে রেখেছে। ওদিকে সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে তখন শহরের ঠিক মাথার উপর পূর্ণিমার ঝাপসা বিশাল চাঁদটাও তোড়জোড় শুরু করেছে আপন উজ্জ্বল্যে ফেরার প্রতীক্ষায়। সে এক অবর্ণনীয় মুহূর্ত। আঠার মত চোখজোড়া লেগে আছে সেদিকে আর অন্তরজুড়ে বয়ে যাচ্ছে এক অপার্থিব শিহরণ। মনে হ’ল অনন্তকাল ঝিম ঝিম চোখে এ দৃশ্যই কেবল দেখতে থাকি। মাগরিবের ছালাতটা সেখানেই আদায় করে ফিরে আসলাম হোস্টেলে।

‘জাবালে নূরুল কুরআন’ পাহাড়ের এই আইডিয়াটা আমার কাছে খুব ইউনিক মনে হয়েছে। উদ্যোক্তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অবহেলা-অযত্নে পড়ে থাকা কুরআনের নুসখার মর্যাদা সংরক্ষণ করা এবং এ ব্যাপারে মানুষের সচেতনতা জাগ্রত করা। সেই উদ্দেশ্যে তারা কতটুকু সফল হয়েছেন জানা নেই, তবে এখানে কোন ব্যক্তি একবার আসলে এই বোধটুকু নিশ্চয়ই জাগ্রত হবে যে, অব্যবহৃত কুরআনের নুসখাগুলো ধুলোবালির মধ্যে অযত্নে ফেলে রাখা কোনভাবেই সমীচীন নয়। হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী হয় মাটিতে পুতে ফেলতে হবে, নতুবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কিংবা পানিতে ডুবিয়ে দিতে হবে। কার্নিশে বা স্টোর রুমে অবহেলায় ফেলে রেখে কুরআনের প্রতি যে অসম্মানমূলক আচরণ আমরা প্রায়ই করে থাকি, তা সত্যিই দুঃখজনক।

কোয়েটা শহরে বিএমসি হোস্টেলে অবস্থানরত দু’জন বাঙালী ছাড়া কর্মসূত্রে আরও দু’একজন বাঙালী আছে শুনেছিলাম। ঈদের ক’দিন পর শাহীন ওর এক বাঙালী আন্টির বাড়িতে নিয়ে গেল। ষাটোর্ধ্ব বয়সী সেই আন্টিকে ৭১-এর যুদ্ধের সময় এক পাকিস্তানী কর্ণেল বিয়ে করে এনেছিলেন। সেই থেকে তিনি পাকিস্তানে আছেন। শশুরবাড়ী পেশাওয়ার। তবে উনার স্বামী কোয়েটাতেই বাড়ি করে স্থায়ী হন। কয়েকবছর পূর্বে তিনি মারা গেছেন। বর্তমানে আন্টি তাঁর এক ছেলে আর পুত্রবধু নিয়ে এই বাড়িতে বসবাস করছেন। তাঁর মেয়ে থাকে আমেরিকায়। প্রতিবছর একবার করে তিনি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করতে যান। স্বামী অঢেল ধন-সম্পদ রেখে গেছেন। ফলে খুব স্বচ্ছলভাবেই জীবন কাটাচ্ছেন। ছেলে আলী ভাইয়ের সাথে কথা হ’ল। আলাপ-ব্যবহারে খুব ভদ্র ও সহজ-সরল, আর মনেপ্রাণে এখন পুরোপুরি পাকিস্তানী। কোয়েটার কোন এক সরকারী অফিসে বড় চাকুরী করেন। বাংলাদেশে দু’একবার গেলেও বাংলা জানেন না। আন্টি আগেই শাহীনকে ফোন করে দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন, তবে বাঙালী রান্না না খাইয়ে খাওয়ালেন পাকিস্তানী রান্না। দুম্বার রোস্ট, মুরগীর রোস্ট, কলিজা ভুনা, আরো নাম না জানা কিছু আইটেম আর সাথে সেই রুটি। আমার পাকিস্তানে এসে ভাতের কষ্টে থাকার কথা শুনে উনি খুব আফসোস করলেন ভাত রান্না করেননি বলে। খাওয়া শেষে উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘দেশ ছেড়ে এভাবে এতদিন আছেন, খারাপ লাগে না’। উনি পরিতৃপ্তির সুরে বললেন, ‘না, আমি অনেক সুখে আছি। কখনও অর্থকষ্টে বা অন্য কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। স্বামী অনেক ভাল মানুষ ছিলেন। আর দেশের জন্যও কখনও বিশেষ খারাপ লাগেনি। কারণ প্রতিবছরই দেশে যাওয়া পড়ে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে কখনও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। যখনই কোন আত্মীয় বিপদে পড়ে, আমি সাধ্যমত সহযোগিতা করি এখান থেকে। তাই দেশের সাথে কোন দূরত্ব অনুভব করি না। দেশে থাকলেও হয়ত ফ্যামিলির সাথে এর চেয়ে বেশী যোগাযোগের সুযোগ পেতাম না’। খাওয়া শেষে আমরা বিদায় নিয়ে চলে আসলাম। আসার সময় উনাদের বাগানের আপেল দিলেন আর সাথে ছাগলের ২ কেজী কাঁচা গোশত দিয়ে দিলেন রান্নার জন্য।

কোয়েটা থেকে ফিরে আসার আগের দিন টিকিট কাটতে গেলাম শহরে। ট্রেনে সীট না পেয়ে বাসেই টিকিট কাটলাম। তারপর বৃটিশ আমলে নির্মিত ঐতিহাসিক সেনানিবাসের পার্শ্বে সেনাবাহিনী পরিচালিত আসকারী পার্কে গেলাম। পার্কে দেখার মত তেমন কিছু নেই। প্রায় ঘাসবিহীন নিষ্প্রাণ বিরাট খোলা মাঠ। কিছু ছোটখাটো গাছপালা আর দর্শনার্থীদের জন্য বসার কিছু ব্যবস্থা। সেই সাথে বাচ্চাদের জন্য কিছু প্রচলিত রাইড। কিন্তু এটুকু ব্যবস্থাই যেন কোয়েটাবাসীর কাছে বিরাট কিছু। শত শত মানুষ সেখানে ভিড় করেছে। কেউ ক্রিকেট খেলছে, কেউ গোল হয়ে কাওয়ালীর আসর বসিয়েছে। পশতু, বালুচ, সিন্ধি কত প্রকার যে ভাষা তাদের মুখে। কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার অবস্থা। তবে যে বিষয়টা চোখে পড়ল, কোয়েটার অন্যান্য স্থানের মত এখানেও নারীদের উগ্র পদচারণা নেই। কিছু ফ্যামিলি এসেছে। তবে পর্দা ও শালীনতার সাথে। আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সচরাচর যেসব চিত্র এ জাতীয় স্থানে আমরা দেখি, তা এখানে শতভাগ অনুপস্থিত। পার্কের শ্রীহীন দশা হতাশ করলেও এই দিকটি ভাল লাগল।

বলা বাহুল্য, দশদিনের কোয়েটা সফরে কোথাও বেপর্দা নারী দেখিনি। পর্দাহীনভাবে ঘোরাটা এদের স্বাভাবিক কালচারেরই বাইরে মনে হয়েছে। ইসলামাবাদের মত এখানেও অনেক মহিলা নিজেই ড্রাইভ করে। বাজার-ঘাটে মহিলাদের উপস্থিতিও যথেষ্ট। অথচ কোথাও এর কোন ব্যত্যয় দেখিনি। তবে এরা প্রচলিত বোরকার পরিবর্তে সালোয়ার-কামীজের উপর লম্বা চাদর পরিধান করে ঘোমটা দেয়। সঊদী বোরকা বা আফগানী বোরকাধারী মহিলা তেমন দেখা যায় না বললেই চলে।

প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে কোয়েটায় বহু অর্থশালী মানুষের বসবাস। শহরে মার্সিডিজ, ল্যান্ডরোভারের মত গাড়ি যথেষ্টই দেখা যায়। রাজপ্রাসাদের মত সুসজ্জিত বাড়িঘরের কোন অভাব নেই। কিন্ত প্রায়ই তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় থাকে না, বাড়ির বাইরের দেয়াল প্লাস্টার না করার এক অদ্ভুত কালচারের

কারণে। এই কৃচ্ছতাসাধনের পিছনে মিতব্যয়িতা নাকি অন্য কোন কিছু করছে তা আমার মোটেই বোধগম্য হয়নি। যে কোন সুন্দর বাড়ী বাইরে থেকে নিতান্তই শ্রীহীন দেখায় এই একটি মাত্র কারণে।

শহরটি অনেক দিন থেকেই তালেবানদের রিক্রুটিং কেন্দ্র হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। এমনকি সাবেক তালেবান প্রেসিডেন্ট মোল্লা ওমর নাকি এখন এই শহরে লুকিয়ে আছেন বলে জনশ্রুতি আছে। যুক্তরাষ্ট্র একবার এখানে ড্রোন হামলাও করেছিল। তারও পূর্ব থেকে স্বাধীনতাকামী বালুচ বিদ্রোহীদের কারণে এখানে সবসময়ই যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে। অস্ত্রবাজি এখানে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। খোঁজ নিলে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই নাকি অস্ত্র-শস্ত্রের খোঁজ মিলবে। বালুচ বিদ্রোহী সংগঠন বালুচ লিবারেশন ফ্রন্ট (বিএলএফ) এবং বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মী (বিএলএম)-এর মত সংগঠনগুলো গত ৬ দশকেরও বেশী সময় থেকে ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান অংশের বালুচিস্তান মিলে সম্মিলিত একটি 'গ্রেটার বালুচিস্তান' রাষ্ট্র গঠনের জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চালিয়ে আসছে। পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন সময় এ আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিলেও তাদের তৎপরতা নিঃশেষ করা যায়নি। এখনও বিক্ষিপ্ত চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগ, পাকিস্তানকে দুর্বল করার কৌশল হিসাবে এই বিদ্রোহীদেরকে গোপনে অস্ত্র-সহযোগিতা করছে ভারত ও আমেরিকা। তবে এটা সত্য, বিদ্রোহ দমনের নামে সেনাবাহিনী প্রতিনিয়ত বালুচ সম্প্রদায়ের লোকজনকে আতংকগ্রস্ত করে রাখে। এ পর্যন্ত বহু মানুষ সন্দেহভাজন হিসাবে সেনাবাহিনীর হাতে কিডন্যাপড হয়েছে শুনলাম। এ নিয়ে এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে। ট্রেনে আসার সময় দেখছিলাম বিভিন্ন পাহাড়ের মাথায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর টহল চৌকি। বালুচ বিদ্রোহীরা প্রায়ই পাঞ্জাব থেকে আসা ট্রেনে চোরাগোপ্তা হামলা চালায়। এমনকি সিবি থেকে কোয়েটার পথে তো আমাদের ট্রেনেরই কোন এক বগিতে গুলি এসে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হুলুস্থুল শুরু হল। এফসি'র কমাণ্ডোরা কুকুর নিয়ে অভিযান শুরু করল চলন্ত ট্রেনের মধ্যে। তারপর সবকিছু ঠাণ্ডা। কি হল, কেন হল, তা জানার কেউ আর প্রয়োজনও বোধ করল না। বিষয়টা সবার কাছে এক প্রকার গা সওয়া হয়ে গেছে।

সহযাত্রী বালুচ সহযাত্রীরা ছিল প্রত্যেকেই বালুচ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সমর্থক। ফলে তাদের কাছ থেকে একটানা কেবল পাঞ্জাবীদের বদনামই শুনে যাচ্ছিলাম। তবে কোয়েটা পৌঁছে কয়েকজন মুরব্বী ও শাহীনের বন্ধুদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম, এখানকার শিক্ষিতদের মধ্যে পাক সেনাবাহিনীর অনাচারমূলক বেশ কিছু পদক্ষেপের কারণে চাপা ক্ষোভ থাকলেও তারা মূলতঃ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষপাতী নয়। কারণ তাদের মতে, এই বিচ্ছিন্নতা বালুচদের জন্য ভবিষ্যতে কোন উপকার বয়ে আনবে না, বরং আরও বেশী ক্ষতির কারণ হবে। কেননা বালুচিস্তানে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও এসবের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন তা বালুচদের হাতে নেই। শুধু তাই নয় বালুচিস্তানের জনগোষ্ঠী নানা গোত্রে-উপগোত্রে বিভক্ত। তারা বিভিন্ন গোত্রীয় শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। তাই বালুচিস্তান যদি কখনও স্বাধীনতার স্বাদ পায়, তবুও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ সে সময় ক্ষমতারোহনের প্রশ্নে অপরিহার্যভাবে এই গোত্রগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বগুলো জেগে উঠবে। শুরু হবে আরেক নতুন যুদ্ধ। তাই শিক্ষিতজনেরা সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে এই বিচ্ছিন্নতার পথে হাটতে চান না। কিন্তু আবেগপ্রবণ স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীরা এসব ভবিষ্যৎ ভাবনার মধ্যে নেই। তাদের যে কোন মূল্যে স্বাধীনতা চাইই-চাই।

শাহীনের সাথে বোলান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। সরকারী হাসপাতাল হলেও ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত। আমাদের স্কয়ার, ইউনাইটেড হাসপাতালের মত উন্নত হাসপাতালগুলোর তুলনায় সুযোগ-সুবিধা কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু চিকিৎসা সেবা সম্পূর্ণ ফ্রি। অবশ্য তারপরও রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট কম। কারণ গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা অনুকূল না থাকায় মানুষ সাধারণতঃ হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে পারে না। আর বড় রকম সমস্যা দেখা দিলে মানুষ কোয়েটার পরিবর্তে কাছাকাছি বড় শহর করাচীতে চলে যায়। হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় উঠে লিফটের সামনে যেতেই দেখি চারিদিকে পোড়া, ভয়াবহ ধ্বংসের চিহ্ন। গত ১৬ই জুন বালুচ বিদ্রোহীরা মেডিকেলে সুইসাইড বোমা হামলা চালালে ৪ জন এফসি'সহ ১০ জন নিহত হয়েছিল। এসব তারই চিহ্ন। নীচ তলায় সিঁড়ির পথেও দেয়ালে দেয়ালে ভয়াবহ গোলাগুলির চিহ্ন এখনো টাটকা। সেদিন যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল মেডিকেলে তার বর্ণনা শুনলাম শাহীনের কাছে।

ঐ দিনই শাহীনের বর্তমান কর্মস্থলেও গেলাম। সেখানে দেখি বিদ্রোহী যোদ্ধাদের জন্য আলাদা একটি ওয়ার্ডই আছে। তালেবানসহ অন্যান্য যোদ্ধারা এখানে চিকিৎসা নিয়ে থাকে। সেই ওয়ার্ডে ঢুকে সদ্য আহত কয়েকজনকে দেখতে পেলাম। কোন অপারেশনে গিয়ে কারো হাতে, কারো পায়ে গুলি লেগেছে। কথা বলতে চাইলাম। কিন্তু ওদের কটমটে দৃষ্টির তীব্রতায় সে ইচ্ছা উবে গেল। সেখানে কেবল প্রবল ঘৃণা কিংবা ক্ষোভের আগুন। যে আগুনকে অবদমিত করার সাধ্য যেন কারো নেই। মনটা তিক্ত বিষাদে ভরে গেল। মানুষে মানুষে এই হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ কি লেগেই থাকবে চিরকাল? যুলুমবাযদের যুলুম কি কখনই থামবে না? অত্যাচারের কষাঘাতে জর্জরিত, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদহারা মানুষগুলোর বুকে জমে থাকা তুষের আগুন কি কখনই নিভবে না? ঐ সুন্দর চোখগুলোতে নরকের আগুনের পরিবর্তে সত্য-ন্যায়ের দীপ্তি কি কখনই জ্বলে উঠবে না? শত্রুকে পরাজিত করতে পারলেই সব হয়ে যায়? শত্রুর ভেসে যাওয়া রক্তের বন্যায় গোসল করতে পারলেই কি বিজয়ী হওয়া যায়? বিজয়ের সংজ্ঞা এত রক্তাক্ত, এত পাশবিক, এত নিষ্ঠুর, এত ক্ষুদ্র আর কত কাল থাকবে এভাবে? জয়-পরাজয়ের সংজ্ঞাকে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনরা যেভাবে মানবতা, ভালবাসা আর কল্যাণের পুষ্পে সুশোভিত করে তুলেছিলেন, তার নযীর আজ কোথায়?

২২ অক্টোবর সকাল দশটায় রেলস্টেশনের পাশেই সাদাবাহার কাউন্টার থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ল। বাংলাদেশের হানিফের মত এই কোম্পানীরও নেটওয়ার্ক প্রায় সারা পাকিস্তান জুড়ে বিস্তৃত। সহযাত্রী হিসাবে পেলাম তেহরানের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কাশ্মীরী ছাত্র তারেক। বাসে ১৪ ঘন্টা জার্নি করে গতকালই সে তাফতান বর্ডার থেকে কোয়েটা এসে পৌঁছেছে। আজ আবার ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে উঠেছে এই বাসে। আরবী ভাল জানে বলে ইরান সম্পর্কে তার কাছ থেকে অনেক কিছু শোনার সুযোগ হ'ল। শী'আদের সম্পর্কে তার সুধারণা দেখে বুঝতে পারলাম কতটা প্রভাবিত

হয়েছে সে। তার কথা হল, ইরানকে বা শী'আদেরকে আমরা যেভাবে দেখি এটা ঠিক নয়। ওরা সুন্নীদের পিছনে এবং সুন্নীদের মসজিদে ছালাত আদায় করতে দ্বিধা করে না। সুন্নীদেরকে তারা মুসলিম হিসাবে সমান দৃষ্টিতেই দেখে। ছাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ তারা করতেই পারে না, বড় উদার মনের তারা। তারা এমনই উদার যে কোম শহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত ধর্মের বই-পত্র রয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্ররা ভর্তি হয়, তাদের কাজ হ'ল ধর্ম নিয়ে নিজের ইচ্ছামত সেখানে গবেষণা করবে টানা দুই বছর ধরে, তারপর যে ধর্মকে সে সত্য বলে অনুধাবন করতে পারবে সে ধর্মের ব্যাপারে তার গবেষণালব্ধ ফলাফল লিখিতভাবে প্রকাশ করবে..এতে কাউকে কোনরূপ চাপ দেয়া হয় না...ইত্যাদি। আমি সব শুনে তারপর শী'আদের বেসিক আক্বীদা সম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্ট যখন ধরিয়ে দিলাম তখন সে চুপ করল। অবশেষে স্বীকার করল ওদের আক্বীদাগত গলদগুলো।

কোয়েটা আসার সময় রেলপথে এসেছিলাম, এখন ফিরতি পথে বোলান পাস হাইওয়ে হয়ে যাচ্ছি। রেলপথের অভিজ্ঞতা ছিল একধরণের, আর এই পথে হ'ল আরেক অভিজ্ঞতা। ট্রেন থেকে বিপরীত দিকের পাহাড়ের গা বেয়ে খাইবার পাসের আদলে এঁকে বেঁকে চলা হাইওয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছিল এক বিস্ময়কর স্বপ্নগাঁথা। আর এখন হাইওয়ে থেকে বিশাল পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে চলা ফিতের মত ট্রেন, আর তার হঠাৎ হঠাৎ গর্তে তথা টানেলের মধ্যে নিমিষে হারিয়ে গিয়ে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তেমনই রূপকথা মনে হচ্ছে। আসার সময় টানেলগুলোতে ট্রেন ঢুকতেই হঠাৎ নেমে আসা অমাবস্যার ঘুটঘুটে আধারে যাত্রীরা যেমন হতবিহ্বল হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠছিল, যাওয়ার সময় তেমনি এখন পাহাড়ের গা বেয়ে সর্পিল ঢালু রাস্তায় বিপদজনক বাঁক নেয়ার সময় নিম্নবর্তী উদর এবং কর্ণকুহরে অপ্রকাশ্যে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়ে যাচ্ছে। সে আন্দোলন অবশ্য সুখকর নয় মোটেই। বিশেষ করে বায়ুচাপজনিত কানের ব্যাথায় এত অসহ্য বোধ করছিলাম যে শত-সহস্র বছরের ইতিহাসের করাঘাতকেও পাত্তা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। একেবারে সমতলে নেমে আসার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। রাস্তার বাম সাইড দিয়ে আরেক সহযাত্রী হিসাবে বয়ে যাচ্ছে সুপ্রশস্ত বোলান নদী। তবে তাতে পানির দেখা নেই। কেবল আপন অস্তিত্বের জানান দিতে এক চিলতে স্রোতধারা বয়ে চলেছে নিঃশব্দে তির তির করে। আর বাকি অংশটাতে অজস্র নুড়ি পাথরের একচ্ছত্র রাজত্ব। মাঝে মাঝে সেই নুড়ি পাথরে ট্রাক বোঝাই করার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে । পানির স্পর্শ পেয়ে কোন কোন স্থানে দূর্দান্ত সবুজ ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে উঠেছে। তপ্ত মরুভূমির বুকে এক টুকরো মরুদ্যান তথা সবুজের পরশ যে কতটা প্রশান্তির হতে পারে তা আর বোঝার বাকি রইল না। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল কালচে পাহাড় ঘেষে বেশ বড়-সড় লোকালয়। সহযাত্রীরা জানালেন, মরুভূমির এই কালচে পাহাড়গুলো মূলতঃ কয়লার খনি। এখানে কর্মরত খনি শ্রমিকরাই এসব লোকালয় গড়ে তুলেছে।

তারপর দিগন্ত বিস্তৃত খারান মরুভূমি, অভ্যন্তরভাগ থেকে অদ্ভুতভাবে খাঁজ কাটা সারি সারি পাহাড়ের ঢিবি, আর তিমির পিঠের মত মসৃণ হয়ে নেমে যাওয়া তার পাথুরে পৃষ্ঠদেশ, পাহাড়ী ঢালে ছাগল-দুম্বার চরে বেড়ানো, খেজুর বাগানে উটের পালের গলা উঁচু করে অলস খাবার অনুসন্ধানের দৃশ্যগুলো অপলক দেখতে দেখতে সিবি চলে আসলাম। সিবি থেকে ডেরা গাজী খাঁ পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পরবর্তী গন্তব্য ডেরা ইসমাঈল খাঁ। রাত ১১টার দিকে ডেরা ইসমাইল খাঁ পৌঁছে রাতের খাবারের বিরতি দেয়া হ'ল। তারপর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাস যখন মিয়াওয়ালী পৌঁছালো তখন রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেছে। মাঝে ঘুমটাও হয়েছে মোটামুটি ভালই। তবে চরম বিরক্তিকর মুহূর্ত ছিল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর যখন গাড়ির টিভি সেটে বাজে হিন্দি গান-বাজনা শুরু হ'ল। ভাঙা উর্দূতে কন্ট্রাক্টরকে ডেকে কয়েকবার নিষেধ করার পরও কাজ হলো না। ভলিউম কিছুক্ষণ লো করে রেখে আবার হাই করে দেয়। আশ্চর্য হলাম গাড়ির একটা লোকও কিছু বলল না। অথচ প্রতিবার ছালাতের ওয়াক্তে বাস থেমে যাচ্ছে কোন মসজিদের পার্শ্বে, আর বাসযাত্রীদের অধিকাংশই নেমে ছালাতও আদায় করছে! যাহোক কোন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ায় সে যাত্রায় বাঁচলাম। মিয়াওয়ালী পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ নগরী। শহরটি পার হওয়ার পর সুন্দর সবুজ পাহাড়ী পথ বেয়ে যাত্রা শুরু হ'ল। এই পথে আরো ১৫/২০ কিঃমিঃ যাওয়ার পর পাহাড়ের উপর থেকে দেখা গেল অনেক নীচে সুপ্রসিদ্ধ নামাল লেক এবং লেকের পাড় ঘেষে ইমরান খানের উদ্যোগে নির্মিত সেই অত্যাধুনিক ইউনিভার্সিটি 'নামাল কলেজ'। এটি নির্মিত হয়েছে সম্প্রতি ২০০৮ সালে, যেখানে ইমরান খান ১০০০ একর জমির উপর অক্সফোর্ডের মত একটি 'সিটি অব নলেজ' নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন।

ঠিক বেলা ১০টায় ২৪ ঘন্টার জার্নি শেষে রাওয়ালপিণ্ডির ফয়যাবাদ বাসস্টান্ডে এসে নামলাম। নামার সময় ড্রাইভিং সীটে দেখি সেই একই ড্রাইভার। সুবহানাল্লাহ! টানা ২৪ ঘন্টা এই লম্বা পথ নির্ঘুম ড্রাইভ করা কিভাবে সম্ভব!! কি ধরণের মানুষ এরা!!

সহযাত্রী তারেককে বিদায় জানিয়ে একটা ট্যাক্সিযোগে ইসলামাবাদে আমার অস্থায়ী ডেরা কুয়েত হোস্টেলে এসে পৌঁছলাম। রুমে এসে হাবীব ভাইয়ের কাছে খবর পেলাম, যে ট্রেনে আমার ফেরার কথা ছিল অর্থাৎ জাফর এক্সপ্রেস ট্রেনে গতকাল দুপুরে বোমা হামলা হয়েছে এবং কয়েকজন যাত্রী তাতে নিহত হয়েছে। এ খবর শুনে দুর্ঘটনার শিকার যাত্রীদের প্রতি সহমর্মিতার পরিবর্তে ট্রেনের টিকিট না পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বার্থপরের মত শুধু 'আল-হামদুলিল্লাহ' পড়লাম। পরে নিজের স্বার্থপরতা টের পেয়ে বিব্রত হলাম নিজেই। খুনে পৃথিবী কেবল খুনই ঝরায় না, মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধকেও বোধহয় হরণ করে নেয় এভাবে।

[ছাত্র, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

বাঙালিত্ব : দেশপ্রেম না ধর্ম

(এক)

আমার জন্ম যশোরে। শীতের ছুটিতে মামার বাড়িতে যেতাম। যশোরের কথা মনে হতেই চোখে ভাসে একটা আলো। ভোরবেলা ছন-ঢাকা মটর গ্যারেজে বাল্ব জ্বলছে কুয়াশার চাদর ভেদ করে। আলো আমি বহু দেখেছি। এরপরেও, শিকাগো কিংবা নিউইয়র্কের চোখ ধাঁধানো আলোর মালা সেই টিমটিমে বাতিটিকে হারাতে পারেনি এখনও। মুহাম্মাদপুরে কেটেছে শৈশব। হয়ত গুলশানের রাস্তাগুলো আরো সুন্দর, বনানীর বাড়িগুলো আরো বনেদি। কিন্তু আজো পৌনে দু'কাঠার পোকামাকড়ের ঘরবসতিগুলোই মনকে আর্দ্র করে। মনে গেঁথে আছে সেন্ট যোসেফের বিশাল সব গাছের ছবি। হয়ত সেন্ট প্লাসিডসের গাছগুলো আরো সজীব, আরো সবুজ; কিন্তু সেগুলোর জন্য আমার মনে ব্যাকুল কোন আকুলতা নেই। মানুষ নস্টালজিক প্রাণী। সে যেখানে বেড়ে উঠেছে তার সাথে হৃদ্যতা থেকে যায় মৃত্যু অবধি। বাংলা অভিধান মতে দেশ মানে স্থান। শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটিকে মানুষ ভালোবাসে। এই ভালোবাসার নাম দেয়া যায় দেশপ্রেম। যে মানুষগুলোকে সে ছোট থেকে দেখে এসেছে, তাদের জন্য টান থেকে যায় মনে। এই টানের জন্মও সেই দেশপ্রেম থেকেই।

মানুষ বাঁচে কেন? একটা স্বপ্ন নিয়ে। গরু স্বপ্ন দেখে না, তার প্রতিবেলা দু'আঁটি ঘাস আর রাতে একটা খুঁটি হলেই চলে। কিন্তু মানুষের চলে না। কেউ যদি মানুষ হয় তাহলে সে শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না। ব্যক্তিভেদে স্বপ্নের পরিসর বদলায়। সবচেয়ে যে ছোট, তার স্বপ্ন শুধুই তার সন্তানদের নিয়ে। তার চেয়ে যে বড়, সে স্বপ্ন দেখে একটা গরীব বাচ্চার পড়ার খরচ দেবে। আরো যে বড়, সে স্বপ্ন দেখে গাঁয়ে কোন অভাবী লোক থাকবে না, খালের উপারের নড়বড়ে বাঁশের সাকোর উপর একটা ছোট্ট ব্রিজ হবে। কেউ স্বপ্ন দেখে একটা হাসপাতালের। সামর্থ্য নেই, তবু আশা থাকে মনের কোণে। মানুষ যখন আত্মকেন্দ্রিকতার উপরে ওঠে, তখন সে তার চারপাশের এলাকার জন্য, মানুষের জন্য কিছু করতে চায়। এ স্বপ্নগুলোর জন্ম একটা আদর্শ থেকে। এই আদর্শের নাম দেশপ্রেম।

বিশ্বায়নের এ যুগে এই আদর্শটা ক্রমেই রূপ বদলাচ্ছে। মানুষ স্বদেশ পাড়ি দিয়ে পরবাসে গিয়ে থিতু হচ্ছে ভাল থাকা ও খাওয়ার আশায়, তথাকথিত উন্নত জীবনযাপনের মোহে। মাতৃভূমিতে যারা আছে, তারাও মত্ত ভোগবাদী জীবনধারাতে। রাতদিন জীবনকে উপভোগের পালায় যখন হঠাৎ ছেদ পড়ে, বিবেকবোধ আত্মাকে তখন সজোরে ধাক্কা মারে। সে মুহূর্তে বিবেককে স্তব্ধ করতে যে আত্মপ্রবঞ্চনার সাহায্য নেওয়া হয়, তার নামও দেশপ্রেম বটে।

(দুই)

ধর্মবোধ সাধারণত মানুষের আদর্শের উৎস হিসাবে কাজ করে। এক সময় চার্চের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইউরোপের মানুষেরা জেগে উঠেছিল। অত্যাচারী-অনাচারী খ্রিষ্ট ধর্মকে তারা তাড়িয়ে দেয় আদর্শগত অবস্থান থেকে। কিন্তু আদর্শের স্থানটা খালি থাকে না কখনই। আধুনিক মননে আদর্শের শূন্যস্থান পূরণ করে জাতীয়তাবাদ। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি মানুষের সহজাত ভালোবাসাকে পুঁজি করে ভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিভাজন শুরু হয়। ইতিহাসকে ভেঙে গড়া হয়, স্বজাতির দুর্বৃত্তদের জাতীয় বীর হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। রক্তখেকো নেপোলিয়নকে হাযির করা হয় আদর্শবান ফরাসী নেতা হিসাবে। গণহত্যার দায়ে দুষ্ট অলিভার ক্রমওয়েলকে ব্রিটিশরা নির্বাচিত করে সেরা দশ ব্রিটিশদের একজনে, ভুলে যায় যে এই লোকই বিদ্রোহ দমনের নামে আইরিশ মেয়েদের মুখ চিরে দিত ক্ষুর দিয়ে। পৃথিবীর সভ্যতার দু'হাযার বছরের ইতিহাসের ঐক্যের কলতানকে ছাপিয়ে ভাঙনের বাঁশি প্রবল হয়। মিলগুলোকে বলা হয় গৌণ, অমিলগুলোকে মুখ্য। দার্শনিকেরা আপন জাতিকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রমাণের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বৃত্তপনায় নেমে পড়েন নির্দ্বিধায়। জর্জ অরওয়েলের ভাষায়-

Nationalism is power-hunger tempered by self-deception. Every nationalist is capable of the most flagrant dishonesty, but he is also—since he is conscious of serving something bigger than himself—unshakeably certain of being in the right.1

জাতীয়তাবাদ কী? এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার মতে, যখন কোন ব্যক্তির আনুগত্য এবং অনুরাগ সব কিছুকে ছাপিয়ে দেশের প্রতি ন্যস্ত হয়, তখন সেই আদর্শকে জাতীয়তাবাদ বলে। তার মানে রাষ্ট্র যা করবে তাকে শুধু মেনেই নিলে চলবে না, তাকে তার আদর্শে লালনও করতে হবে। এই আদর্শের মূল যে কত গভীরে প্রোথিত হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভিয়েতনামে আমেরিকান নৃশংসতার সমর্থকদের স্লোগানে- `My country, right or wrong' কিংবা `America, love it or leave it'

এই স্লোগান অতীত হয়ে গেছে এমন ভাবার অবকাশ নেই। আজো এই বাংলাদেশে প্রচলিত 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র বিপক্ষে কিছু বললে তাকে পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে চলে যেতে বলা হয়।

দেশপ্রেমের মত সহজাত একটি প্রবৃত্তির দুর্বৃত্তায়ন হল কিভাবে? জাতীয়তাবাদের হাতে দেশপ্রেম ছিনতাই হয় সেক্যুলার জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা পৃথিবীতে প্রবল হবার পর। রাষ্ট্রনায়করা পরিকল্পিতভাবেই দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদের সীমানা মুছে একে অপরের সমার্থক করে ফেলেছিল। কেন? কারণ দেশপ্রেম মানুষ তাড়িয়ে নেবে এমন একটা হাতিয়ার। অন্যায়কে ন্যায় বানাতে একটা আদর্শিক ভিত্তি লাগে। আর দেশপ্রেম সেই ভিতটা দেয়। ১৯৭১ সালে যারা পাকিস্তান নামক দেশটার প্রেমে অন্ধ ছিল তারা পাক আর্মিদের নৃশংসতায় সাহায্য করেছে। রাষ্ট্রের আনুগত্যের সংজ্ঞায় এরাও দেশপ্রেমিক ছিল। যদি আজ বাংলাদেশ স্বাধীন না হত, রাজাকারের বদলে এরা এখন পরিচিত হত দেশপ্রেমিক, দেশের সূর্যসন্তান হিসাবে। আর মুক্তিযোদ্ধারা বিবেচিত হতো বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী হিসাবে, কুলাঙ্গার হিসাবে। এভাবেই জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম ভাল-মন্দের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়, নতুন একটা সীমারেখা তৈরী করে। যত অত্যাচারী শাসকই হোক না কেন, যত অন্যায় আহ্বানই হোক না কেন দেশপ্রেমের দাবী হচ্ছে সে অন্যায়কে ন্যায় মেনে

তার পক্ষে কাজ করা। একই কাজ হিটলার করিয়েছিল জার্মান জাতিকে দিয়ে। পিতৃভূমির উচ্চ মর্যাদার রক্ষার্থে লক্ষ মানুষের মৃত্যুও আপত্তিকর মনে হয়নি সাধারণ জার্মানদের কাছে। দেশপ্রেমের থাবা থেকে বাঁচতে পালিয়ে যেতে হয়েছে বিবেকবানদের। এই দেশপ্রেমের দোহাইয়ে পাকিরা তৈরী করে দিল শান্তিবাহিনী। তারা মানুষ মেরে শান্তি আনতে চাইল এ বাংলায়। এই দেশপ্রেমের ডাক আমরা আজও শুনতে পাই: 'শিক্ষা-শান্তি-প্রগতি' যাদের মূলমন্ত্র তারা মানুষ ধরে ধরে যবাই করে দেওয়ার আহবান জানায়। যে মঞ্চ থেকে বিচারের দাবি ওঠে সেই একই মঞ্চ থেকে বিচারের রায় দিয়ে দেওয়া হয়। আকাঙ্খিত রায় না পেলে কী পরিণাম হবে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রাধীন আদালত অবমানিত হতে ভুলে যান। আমরা দেশপ্রেমের ঠুলি চোখে বেঁধে পুরো ব্যাপারটার প্রহসন উপেক্ষা করি।

(তিন)

দেশপ্রেমিক ব্যবহার করার সবচেয়ে সফল অস্ত্র তাকে একটি ধর্ম হিসাবে গড়ে তোলা। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক তাত্ত্বিক গুস্তাভো হার্ভে বলেছিলেন, For the patriotism of modern nations is a religion (Notes on Nationalism" (Polemic, No 1, October 1945, May 1945) . এ দেশেও মানুষের আবেগকে পুঁজি করে ক্ষমতালোভীরা নতুন একটি ধর্মের প্রবর্তন করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে উর্দূভাষীদের কচুকাটা করা হয়েছিল। পাকরা না, বাঙালিরা করেছিল। যারা বেঁচে গিয়েছিল তাদের করা হয়েছিল খোঁয়াড়ে বন্দী। এখনও ঢাকার বুকে সেই 'ক্যাম্প'গুলো স্বগৌরবে বর্তমান। দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী অবাঙালিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, 'বাঙালি হয়ে যাও'। একটি ধর্ম নাযিল হতে সময় লাগে। বাঙালি ধর্ম নাযিল হয়নি এ পৃথিবীতে, বরং বঙ্গদেশে উৎপাদিত হয়েছিল।

প্রতিটি ধর্মের দু'টি দিক আছে বিশ্বাস, creed ও আচার-প্রথা, rituals। বাঙালি ধর্মের বিশ্বস্ত বাঙালি সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুগত্য। নামে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হলেও মূলতঃ হিন্দু বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে বেছে নেওয়া হয়েছে বাঙালি ধর্মের জন্য। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং পূর্বপুরুষে দেবীপূজার রীতি থাকায় দেশকে মা হিসাবে মেনে নিতে সমস্যা হয়নি বাঙালি মুসলিমদের। জাতীয় সঙ্গীতে গাওয়া হল, 'মা, তোর বদনখানি মলিন হলে...।' যে তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞানমনস্ক হিসাবে গর্ব করছে তারাও ভেবে দেখে না প্রকৃতির মুখাবয়ব আছে কিনা। যা নেই তা মলিন হতে পারে কিনা। দেশাত্মবোধে সেজদা করা হলো বিশ্বমাতাকে সেজদা করার ন্যায়। যেমন,

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ।।

নিশ্চল প্রকৃতিকে আল্লাহর গুণাবলী দেওয়া হলো নির্দ্বিধায়;

তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।।

কৃষক রোদে জ্বলে, পানিতে ভিজে ধান উৎপাদন করে তার পেটে লাথি মারতে হবে ধানের দাম কমিয়ে। আর বন্দনা করতে হবে অন্নদাত্রী মায়ের, আল্লাহ্‌র এক নাম যে আর-রযযাক, সে কথা ভুলেও মুখে আনা যাবে না। 'রব্বুল 'আলামিন' নামটা সূরা ফাতিহাতে তালা মেরে আটকে রেখে দিতে হবে, বাস্তব জীবনে গাইতে হবে মাতার জয়গান। আসলে কী রাষ্ট্র আর মা এক? মা কি বদলানো যায়? আমার দাদার 'মা' ভারতকে ভেঙে নতুন 'মা' বানানো হয়েছিল পাকিস্তান। আমার বাবারা নতুন মাকে আবার ভাঙলেন, এলো বাংলাদেশ। আমার বাবারা ভারত মাকে ঘৃণা করা শিখলেন, আমাদের ঘৃণা করতে শেখানো হল পাকিস্তানকে। নতুন মাকে ভালোবাসার শর্ত এটাই আগের মাকে ঘৃণা করতে হবে। যে মা, মাটিকে রক্ষা করার জন্য প্রাণত্যাগের সংকল্প করা, সেই মায়ের উপরেই হামলে পড়তে হবে ক'দিন পরে। যে মাকে মানুষ কাটে, মানুষ জোড়া লাগায় তাকে 'ইলাহ্' হিসাবে মেনে নিতে হবে, প্রকৃত বাঙালি হতে হলে।

নানা ধর্মের মতো বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধর্মে নানা প্রথাগত আচরণও আছে যেমন, বিমূর্ত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প অর্ঘ্য দেওয়া, চেহারায় পতাকার তিলক আঁকা, মোমবাতি জ্বেলে শোক জানানো, মৃতদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা কিংবা আকাশে ফানুশ ওড়ানো। এ ধর্মে আছে উৎসব শহীদ, স্বাধীনতা কিংবা বিজয় দিবস। আছে তীর্থস্থান শিখা অনির্বাণ, শহীদ মিনার আর স্মৃতিসৌধ। আছে উৎসর্গ বিরুদ্ধবাদীদের জীবন, সাধারণ মানুষের জীবন। এ ধর্মে দীক্ষিতরা নেকী কামানো চকচকে চোখে স্লোগান দিয়ে রাজপথ কাঁপায় 'ধরে ধরে যবাই করো'; পিছনে থাকে রাষ্ট্রের রক্ষীবাহিনী। বাঙালি ধর্মের জন্য আলাদা উপাসনালয় লাগে না, বিদ্যালয়ই আচ্ছা। শিশুরা জাতীয় পতাকাকে সালাম করে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে দিন শুরু করে। 'চেতনা'ধারী নবী সেজে ধর্মগ্রন্থ লেখেন, শিশুরা তা পড়ে পাঠ্যবইয়ে, বুড়োরা সংবাদপত্রে। লিও তলস্তয় বড় চমৎকারভাবে বর্ণনা করে গেছেন পদ্ধতিটা,

In the schools, they kindle patriotism in the children by means of histories describing their own people as the best of all peoples and always in the right. Among adults they kindle it by spectacles, jubilees, monuments, and by a lying patriotic press.

(চার)

বাঙালি ধর্মে পীর প্রথাও বিদ্যমান। রাজনৈতিক নেতারা মুরীদদের পার্থিব স্বপ্ন দেখায় দশ টাকার চাল, ঘরে ঘরে চাকরি, পদ্মা সেতু ইত্যাদি ইত্যাদি। পীরদের খাদেম হিসাবে থাকে মুক্ত মনারা, বণিকেরা, প্রশাসনিক চাটুকারেরা। পীর এবং খাদেমদের গাড়ির বহর, বাড়ির উচ্চতা দীর্ঘ হতে থাকে। মানুষ সবই বোঝে তাও পাঁচ বছরে একবার গিয়ে ভোটের নযরানা দিয়ে আসে। ভোট কিনে পীরেরা রাষ্ট্রের মালিক বনে যায় সুখ আর সুখ। বিদেশী গ্যাস-তেল কোম্পানির কাছে মায়ের রক্ত বিক্রির সুখ। মায়ের আকাশ মুক্ত রাখতে বিমান কেনার সুখ। সুখের আগুন থেকে বেরিয়ে আসে শেয়ার বাজার, হলমার্ক, ডেস্টিনি, কাল বেড়াল নামের কিছু স্ফুলিঙ্গ। সুখের আগুনের জ্বালানী হয় সীমান্তের মানুষ, পিলখানার সেনাকর্মকর্তা, ক্ষমতাচ্যুত পীরের অবুঝ মুরীদেরা। ১৯০৫ সালে গুস্তাভো হার্ভে যা বুঝেছিলেন তা আমরা আজো বুঝিনি,

A country of the present time is nothing but this monstrous social inequality, this monstrous exploitation of man by man.

আস্তে আস্তে পৈত্রিকসূত্রে ধর্ম পাওয়া মুসলিমরা বিশ্বাস আনে বাঙালি জাতীয়তাবাদে, সংস্কৃতি হিসাবে তারা যেটা ধারণ করে তাকে দেখতে কখনো কখনো ইসলামের মতো লাগে বৈকি। তারপরেও হঠাৎ একদিন বাঙালি ইসলাম আর বাঙালি জাতীয়তাবাদে ঠোকাঠুকি লেগে যায়। তখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দেয়া হয় ইসলাম শিক্ষা বই থেকে: দেশপ্রেম ঈমানের অর্ধেক।

(পাঁচ)

ধর্ম হিসাবে দেশপ্রেম বড্ড একচোখা। রবীন্দ্রনাথের উপাধি 'বিশ্বকবি' আমরা জানি। উদ্দেশ্য বাংলা পরীক্ষায় বেশি নম্বর। তিনি যে সীমান্তের বেড়াজাল কাটিয়ে বিশ্বমানবতার মধ্যে ঐক্যের সূত্র বাঁধতে চেয়েছিলেন সে উপলব্ধিটা আমাদের কখনোই শেখানো হলো না। দেশ বলতে যদি রাষ্ট্র ধরা হয় তবে তার উপকরণ দু'টি মাটি ও মানুষ। মাটি মানে প্রকৃতিঅবোধ নদী, মূক পাহাড়, শ্যামল সবুজ, সজীব সব না-মানুষ। এদের সবার জীবন আছে, ভাষা আছে যদিও তা আমাদের বোধের বাইরে। দেশপ্রেম বলতে যদি আমরা বুঝি রাষ্ট্রের সীমানাকে ঘিরে ভালোবাসা তাহলে পঞ্চান্ন হাযার বর্গমাইলের বাইরের প্রকৃতিকে কি ভালোবাসতে নেই? সবই তো একই স্রষ্টার সৃষ্টি। আর যদি দেশপ্রেম বলতে আমরা বুঝি দেশের মানুষকে ভালোবাসা তাহলে প্রশ্ন আসে কেন শুধু দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হবে, কেন গোটা দুনিয়ার মানুষকে নয়? মানবিকতাকে কাঁটাতারে আবদ্ধ করার যুক্তি কী?

১৯৪৭ সালের ৮ই জুলাই জীবনে প্রথমবারের মত ভারতে আসার পর সাইরিল রেডক্লিফকে দায়িত্ব দেয়া হল ভারত ভাগ করে দাও। তিনি টেবিলে বসে কলম চালালেন, সীমান্ত তৈরী হ'ল। আমার দাদাকে বলা হ'ল, পশ্চিম দিনাজপুরের যে গ্রামটিতে তুমি বড় হয়েছ সেটা এখন ভারত। তুমি পাকিস্তানী। তল্পি-তল্পা গোটাও। এক অপরিচিত জায়গায় বসিয়ে তাকে জানানো হল এটা তোমার দেশ, একেই তোমার ভালোবাসা দিতে হবে। শৈশবের গ্রাম, গ্রামের মানুষগুলো আর তোমার আপন কেউ না। তোমাকে এখন প্রেম করতে হবে চট্টগ্রামের মানুষের সাথে, যাদের একটা কথাও তুমি বোঝ না। রাষ্ট্রীয় আদেশে প্রেম। ধর্ম হিসাবে বাঙালি দেশপ্রেম যে আসলে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রভুদের সংজ্ঞার উপরে টিকে আছে এই তথ্যটুকুই ধর্মটা মিথ্যা হবার জন্য যথেষ্ট।

আমরা বিশ্বাস করি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা একজনই এবং এই পৃথিবীর মালিক তিনিই। আমাদের আগে বহু মানুষ এসেছিল, যারা 'দেশ আমার, মাটি আমার' বলে মিথ্যা গর্ব করেছিল। এই দেশ, মাটি একই আছে কিন্তু সেই মানুষগুলো মাটির তলায় চলে গেছে। যখন আমরা এই পৃথিবীতে আসিনি তখন আমাদের দেশ কী ছিল? আমরা যখন মরে যাবো তখন আমাদের দেশ হবে কোনটা? মাটির তলায় কোন রাজার রাজত্ব চলে? কোন পুলিশ ডাণ্ডা মারে? কোন আদালত বিচার করে? যিনি বলেছেন, 'তিনি আগে বাঙালি পরে মুসলিম' তিনি কি দেশের নেতাদের আল্লাহ্‌র উপরে স্থান দিচ্ছেন না? এই নেতাদের চরিত্র কী আমরা ভালো করে জানি না? এরা যে আমাদের আখেরাতে কেন দুনিয়াতেই জাহান্নাম দেখানোর জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে সেটা কি আমরা বুঝি না? এদের আমরা আল্লাহ্‌র চেয়েও বেশি ভালোবাসছি? এদের ক্ষমতা দখলের লোভে আমরা আমাদের জীবন বিকিয়ে দিচ্ছি? আমরা এত জেনে-বুঝেও এদের হাতের পুতুল হচ্ছি?

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে, এই বাংলাদেশ না, পৃথিবীটাও না আমাদের সত্যিকারের দেশ জান্নাত। আমরা সেই জান্নাতের জন্য কাজ করি যেখানে আমরা একদিন ছিলাম, যেখানেই আমরা যেতে চাই। তাই আমরা প্রকৃতির বদলে প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়েছি। আমরা এই পৃথিবীর ভণ্ডদের না, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছি। দু'টিই আমাদের সচেতন প্রয়াস। আমরা জানি, কেন এই বেছে নেওয়া? যদি এই অবস্থানকে অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে পৃথিবী থেকে চলে যেতেও হয় আমরা রাজি। পৃথিবী কখনোই আমাদের ছিল না, সেটাকে ঘিরে স্বপ্নও তাই আমরা সাজাই না। আমরা সাধারণ মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সাধ্যে যা কুলায়, তাই করতে চাই। এই মঙ্গল কামনাটাও সীমানা দিয়ে আবদ্ধ নয়। আমরা এই দেশের মানুষের জন্য যা চায়, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যও তাই চায়। আমাদের কাছে এটাই দেশপ্রেম। আর এই দেশপ্রেমের উদ্দেশ্য মানুষের মনোতুষ্টি নয়, একুশে পদক পাওয়া নয়, ববং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহ যেন আমাদের আবেগটাকে সৎ কাজে ব্যবহার করার তৌফিক দেন, মন্দ মানুষদের চক্রান্ত বোঝার তৌফিক দেন, ইসলাম বুঝে জীবনটাকে অর্থবহ করার তৌফিক দেন! আমীন!

শরীফ আবু হায়াত অপু
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

বেদনার চোরাবালি

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী যে, আমরা আজ মুসলিম। আমাদের জন্ম কোন না কোন মুসলিম-দম্পতির ঘরে। কিন্তু মুসলিম হয়েও আমরা আজ অন্ধ-বোবা ও বধির। মনে হচ্ছে আমাদের পদদ্বয় লোহার শিকলে আবদ্ধ। হাত দু'টি চোরের মত পিছ মোড়া করে কাঁঠাল গাছের সাথে বাঁধা। সীমা যেন মোমগলা গলে আমাদের কর্ণ দু'টির অবয়ব পূর্ণ করে দিয়েছে। যেখানে অত্যাচারে নিপড়িত কোন মুসলিম ভাইয়ের কান্না-চিৎকার প্রবেশের কোনই অনুমতি নাই। পাথরের মত পাষাণ-হৃদয়ের সংকল্প করেছে আঁখি। যা থেকে এক ফোঁটা লবণাক্ত পানি তো দূরে থাক মিঠা পানিও প্রবাহিত হয় না। মুখটাতো অনেক আগেই বোবা হয়ে গেছে। আমরা রিমোট কন্ট্রোল পুতুলের মত নেচে যাই। নীরব-দর্শকের মত দেখে যাই। পাগলের মত গেয়ে যাই। আমাদের মধ্যে নেই কোন উত্তেজনা, নেই কোন প্রতিবাদ, নেই কোন ক্ষোভ, নেই ঈমানের তেজক্রিয় শক্তি। কোথায় গেল সেই আবুবকরের ঈমান? যে ঈমানে ছিল দৃঢ় মযবুতি। কোথার সেই ওমরের রাজনীতি? যে রাজনীতির ফলে অর্ধপৃথিবী তাঁর হস্ত গত হয়। কোথায় গেল সেই খালেদের হুংকার? শত যুদ্ধজয়ী যে হাতে ছিল শত্রু মোকাবেলার জন্য তরবারি। আমাদেরও সেই রূপই হাত আছে। কিন্তু তরবারি বদলে ইহুদী খ্রিষ্টের দেওয়া

তসবীহ, যা সম্মানের সাথে হাতে ধারণ করে মসজিদের এক কোণায় বসে জপতে থাকি। মসজিদের অপর পার্শ্বে যে কী হচ্ছে সে দিকে কোন খেয়ালই নেই। এটাই বর্তমানে বাঙালীর কালচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাইতো জীবনানন্দ দাস গাইতে সাহস পেয়েছেন যে, 'জপে ঈদগাহেতে তসবীহ ফকির পূজারী মন্ত্র পড়ে সন্ধ্যা-উষার বেদ-বাণী, যার মিশে কোরআনের স্বরে। সন্নাসী আর পীর মিলে গেছে হেবা মিশে গেছে হেথা মসজিদ মন্দি'।

মসজিদের চারদেয়ালে অপর পার্শ্বে চলছে ছিনতাই, ডাকাতী ধর্ষণ লুটপাট, খুন ইত্যাদি। জাতি! তুমি কি একটুও ভেবে দেখছ না যে, একটু পরে তোমার অবস্থা কী হবে? জাতি! একটু পরে দেখবে মসজিদ আছে। মসজিদের চতুর্দিয়াল ঠিকই আছে। মসজিদের মেম্বররে লাঠিটাও আছে। ঘড়িটাও টিক টিক করে আগের মতই চলছে। সবই ঠিকই আছে। কিন্তু দেখবে মাঝে শুধু তুমিই নেই, তুমি কি দেখছ না? ওরা তোমার ভাইদেরকে কীভাবে দলে দলে বিভক্ত করে ছাড়ছে। এভাবে ছন্ন ছাড়া করে রক্ত চুষে খাচ্ছে কাল্পনিক ভ্যাম্পারারের মত। জাতি! এখনো সময় আছে ঐ রঙ্গিন তাসবীদানা ছুড়ে ফেলে মূল ইসলামী শিক্ষায় দিক্ষিত হওয়ার। অতএব তোমার উচিত হবে কাপুরুষের মত ঘরের কোণগুলি না পরিমাপ করে জিহাদী বেশ ধারণ করা। তাতে তুমি ইহকালে মুক্তি পেতে পার অথবা খালেদী আশার সেই তিন অক্ষরের শব্দ শহীদী মর্যাদা লাভ করতে পার। তবে সাবধান! আল্লহ্‌র সর্বশেষ ঐশিবাণী কুরআন ও শেষ নবী (ছাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী সুন্নাহ্‌র সনদ থেকে এক বিন্দুও পিছলে কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নামক গাছের তলাতেই ছায়া গ্রহণ তোমার পথে একমাত্র শ্রেয় থেকে শ্রেয়তর কাজ হবে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবন প্রণালীর সকল কাজ সমাধা করার এবং শত্রুর মোকাবেলার শক্তি দান করত শত্রুর মোকাবেলা করার তাওফীক দিন। আমীন!

-সাঈদ আল-মাহমূদ, নবম শ্রেণী,
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

Thirty first Night (থার্টি ফার্স্ট নাইট)

সময় ও কালের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে সূচনা হয় নতুনের। ঠিক সেই নিয়ম অনুসারেই পরিবর্তন এসেছে আন্তর্জাতিক ক্যালেণ্ডারের শিরোনামে। ২০১৩-কে বিদায় জানিয়ে নতুন করে পদযাত্রা শুরু হয়েছে ২০১৪ সালের। '১ জানুয়ারী'-কে বলা হয় ইংরেজী নববর্ষের প্রথমদিন। খ্রিষ্টীয় নববর্ষ হিসাবে '১ জানুয়ারী' উৎযাপন শুরু হয় কয়েকশ' বছর আগে। সর্বপ্রথম নববর্ষ উৎযাপন শুরু হয় খ্রিষ্টের জন্মের ২০০১ (দু'হাযার) বছর আগে। আর সে সময় '১ মার্চ'-কে বলা হত নববর্ষের প্রথমদিন। কারণ রোমান দিন পঞ্জিকা অনুসারে মার্চ থেকে ডিসেম্বর এই দশ (১০) মাসে বছর গণনা হত।

১ জানুয়ারী নববর্ষের প্রথম দিন হিসাবে গণনা শুরু হয় খ্রিষ্টের জন্মের ১৫৩ বছর আগ থেকে। সে সময় জুলিয়াস সিজার প্রাচীন রোমান দিন পঞ্জিকায় ১ জানুয়ারীকে বছরের প্রথম দিন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। মধ্যযুগীয় সময়ের ৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এটি চালু হয়। তবে ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ন দিন পঞ্জিকা অনুযায়ী ১ জানুয়ারী বছরের প্রথম দিন হিসাবে চালু করা হয়। আর বৃটিশরা তাদের পার্লামেন্ট গ্রেগরিয়নদের ক্যালেণ্ডারকে নিজেদের ক্যালেণ্ডার হিসাবে গ্রহণ করে *(দৈনিক সমকাল, ১ জানু, ২০১৩)*। যাই হোক সময় ও কালের বিবর্তনে মানুষ ১ জানুয়ারীকেই ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিন হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই দিনটিকে ঘিরে মানুষ যে স্বপ্নিল আয়োজন করে চলছে তার লাভ বা স্বার্থকতা অথবা ধর্মীয় স্বীকৃতিটাই বা কতোটুকু? সূর্য মহান আল্লাহ হুকুমেই পূর্বাকাশে উদিত হয়ে পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। ৩১ ডিসেম্বার, ২০১৩-তেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ছিল কি? যদি নাই থাকে তাহলে কেন কুয়াকাটা, কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র সৈকতে এই দিনটিতে লাখো মানুষের সমাগম ঘটে? কেনইবা লাখো মানুষ তাদের মূল্যবান সময় ও অর্থ নষ্ট করে বছরের শেষ দিনে সূর্যের অস্তলগ্ন মুহূর্তটি দেখতে গিয়েছিল? তাদের সমাগমে এটাই মনে হচ্ছিল যেন বছরের প্রথম দিন সূর্যের উদয় হয়েছে আর আজ শেষ দিনে অস্ত যাচ্ছে। এর মাঝে একদিনও অস্ত যায়নি। আর এ সকল আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় পুরাতনকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে গ্রহণ করার বহুমুখী কর্মসূচী।

বিশ্বের সকল দেশের উন্নত হোটেল আর রেস্টুরেন্টগুলো লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয়ে আয়োজন করে এই বর্ণিল অনুষ্ঠানের। বিভিন্ন রঙ্গের মসৃণ কাপড় ও বাইরের সবগুলো পয়েন্ট লাল, নীল, সবুজ বঙ্গের রঙ্গীন আলোয় আলোকিত করা হয় হোটেল রেস্টুরেন্টের সর্বত্র। আর টেবিলগুলোতে শোভা পায় রকমারি স্বাধের নামি দামি খাবারসমূহ। হোটেল আর রেস্টুরেন্টগুলো সাজসজ্জা ও আলোকিত করাটা কয়েক যুগের পুরনো ঐতিহ্য হলেও বিগত কয়েক বছর থেকে নতুন সাজে সাজানো হচ্ছে গিফট কর্ণারগুলো। নতুন বছরকে কেন্দ্র করে বাহারি ডিজাইনের নযর কাড়া উপহার সামগ্রী শোভা পাচ্ছে সেই সব দোকানগুলোতে। আতশবাজি আর রঙ্গ মাখামাখিতো পুরা দিনটির মৌলিক কাজে পরিণত হয়। এবছরে আতশবাজি প্রদর্শনীতে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে দুবাই। দেশটির উপকূলে ৯৪ বর্গ কি.মি. ব্যাপি এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৬ মিনিট ব্যাপী আতশবাজি প্রদর্শনীতে ৫ লক্ষ মানুষ অংশ নেয়। যার প্রস্তুতি চলছিল বিগত দশ (১০) মাসব্যাপী। কুয়েতে ১ ঘন্টাব্যাপি প্রদর্শনীতে ৭৭ হাযারের বেশী আতশবাজির সমাগম ঘটে। প্রধান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন বুর্জ খলিফা এবং অভিজাত হোটেল আটলান্টায় । তার পরিকল্পনায় ছিল একটি মার্কিন কোম্পানী। ১০০ (একশত) কম্পিউটার, ২০০ (দু'শত) প্রকোশলী এবং ৬ মিলিয়ন অর্থের প্রয়োজন হয় এই আয়োজনে *(এন.ডি.টিভি পত্রিকা, ২ জানু, ২০১৪)*।

বিবেকবান পাঠকের কাছে প্রশ্ন, ইরাক আফগানিস্তান মিয়ানমার সহ সারা বিশ্বের লক্ষ-কোটি মুসলমান যেখানে খাদ্যাভাবে ক্ষুধার তাড়নায় না খেয়ে মরছে, যাদের আর্তচীৎকার ও র্নির্মম আহাজারিতে ভারি হচ্ছে আকাশ বাতাস, লুণ্ঠিত হচ্ছে হাযারো মুসলিম মা-বোনের ইয্যত, সে সময় মিলিয়ন মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যায়ে কিসের নেশায় মত্ত হয়েছে? দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ সকল আয়োজনে উন্নত ও পশ্চিমা দেশগুলো থেকে পিছিয়ে পড়ে নেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে

Contents

পরিচিত আমাদের এই বাংলাদেশ। রাজধানী রূপালি বাংলা পাঁচতারা হোটেলগুলো সহ দেশের সবগুলো যেলার নামিদামি হোটেলগুলোতেও আয়োজন করা হয় বর্ষ বরণের বিভিন্ন স্বপ্নিল অনুষ্ঠানের। বিভিন্ন জায়গায় আয়োজন করা হয় বড় বড় কনসার্টের। আর সে সকল কনসার্টের মঞ্চ কাঁপাতে দেশের বড় বড় শিল্পীও শিল্পগোষ্ঠীকে অনেক আগে থেকেই সিরিয়াল দিয়ে নিয়ে আসা হয় একটু বেশি দামে। অনেক আগে থেকেই বুকিং চলে ডেকোরেশন ও কমিউনিটি সেন্টারগুলোতে। আর এসকল আয়োজনের মধ্যদিয়ে সন্ধ্যা থেকে নেচে গেয়ে যখনই রাত ১২টা বাজে সবাই মিলে হৈচৈ করে আতশবাজি ও পটকা ফুটিয়ে আর বাহারি স্বাধের খাবার খাওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে। আর একেই নাকি বলে 'Thirty first Night'। আর এক শ্রেণীর মানুষ (?) মদ, আফিম, ফেনসিডিল ভক্ষণ করে মেতে উঠে জঙ্গলের হিংস্র হায়নার মত উন্মাদ হয়ে মহাযজ্ঞের সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক কর্ম নারী ভোগের মরণ নেশায়। এই একটি রাতকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের লক্ষ-কোটি নারীর সতিত্বের শুভ্র আবরণে কলঙ্কের কালিমা লেপন করে রাতের নিকোশ কালো আধার কাটিয়ে ভোরের সোনালি সূর্যের উদয় ঘটে। এখান থেকেও পিছিয়ে পড়ে নেই সোনার বাংলার সোনার ছেলে মেয়েরা। হে বঙ্গীয় পিতা! সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে মসজিদের কোণায় বসে তসবীহ টেনে নিজেকে জান্নাতের অধিবাসী মনে কর না, সারাজীবন ইসলামী আন্দোলন করেই নিজেকে জান্নাতবাসী মনে কর না। হৃদয়ের ভালবাসা উজাড় করে অতি যত্নে জীবনের সব আয় রোজগার ব্যয় করে তোমার যে সোনামণিকে ১৮/২০ বছরের পূর্ণ যুবক/যুবতীতে পরিণত করেছ একটু তালাশ করে দেখ সে আজকের এই রাতে কোথায় রয়েছে। নতুবা তোমাকে সে দাউস বানিয়ে তোমার জান্নাত হারাম করে ছাড়বে।

১ জানুয়ারী ভোরের সূর্যটা পূর্বাকাশে উদয় হয় অন্যসকল দিনের মতই তারপরও কেন সোনার বাংলার লাখো ঘরে আয়োজন করা হয় ভাল খাবারের? যে দেশের লক্ষ-কোটি জনগণ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে, সে দেশে কেন লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয়ে আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানের? যে দেশের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান সে দেশের জনগণ কেন গ্রহণ করল এই বিজাতীয় সংস্কৃতি? ১ জানুয়ারী ২০১৩-তেও একইভাবে আয়োজন করা হয়েছিল 'Happy New year' কিন্তু কতটুকু Happy ছিল ২০১৩ সালে দেশের মানুষ? নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাসক গোষ্ঠীর চাপের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ রানা প্লাজাতে সহস্রাধিক নিরীহ মানুষকে রড আর ইট-সিমেন্টের শক্ত কনক্রিটে পিষ্ট হতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাজনীতির মারপ্যাচে হারিয়ে গেছে শত শত অসহায় ভাই-বোনের লাশ। হাযার হাযার ভাই-বোন নির্মমভাবে আহত হয়ে অসহনীয় যন্ত্রনা বুকে চেপে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

৬ মে শাপলা চত্বরে গভীর রাতের নিকষ কালো আঁধারে যালেম শাসকের হায়নারূপী গোলাম প্রশাসনের গুলির শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে আল-কুরআনের হাফেযসহ অসংখ্য ইসলাম প্রিয় মানুষকে। এছাড়াও সারা দেশের অসংখ্য নিরীহ মানুষ হত্যা, গুমসহ নানাবিধ নির্যাতন ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। প্রায় সারাটা বছর জুড়ে হরতাল, অবরোধ আর জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচীর শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে। পেট্রোল বোমার শিকার হয়ে বার্ন ইউনিটে ডুকরে ডুকরে কেঁদে মরছে অসংখ্য মানুষ। মানুষরূপী নরপিচাসদের লালসার শিকার হয়ে সম্ভ্রম হারাচ্ছে অসংখ্য মা-বোন। কিন্তু তাদের চিৎকার এদেশের শাসক গোষ্ঠীর কর্ণ পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাদের চিৎকারে হয়ত শুভ্র জাতীয় সংসদ ভবন লজ্জায় কালো বর্ণ ধারণ করেনি, তাদের কষ্টে ম্লান হয়ে হয়ত বাংলার জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়নি, কোন মানবধিকার গোষ্ঠী শোক প্রকাশে কালো ব্যাচ ধারণ করে রাজপথে মৌনমিছিল করেনি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণকামী সাংবদিকরাও তাদের পক্ষে কোন কলম ধরেনি, কলম ধরেনি জাতীয় পত্রিকার কোন বিশিষ্ট কলামিষ্ট। কিন্তু তাদের বুকফাটা আর্তনাদ ও করুণ চাহনি ঠিকই সাত আসমানকে ডিঙ্গিয়ে আরশে আযীমের সুমহান অধিপতি দু'জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কর্ণকূহরে পৌঁছে গেছে।

মুক্ত গগনে ডানা মেলে উড়ন্ত প্রাণচঞ্চল পাখি গুলোও হয়তবা তাদের ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে ফেলেছে দু'ফোটা চোখের জল! কিন্তু বাংলার এক শ্রেণীর তরুণ প্রজন্মের দামাল ছেলে-মেয়েদের হৃদয়ে সামান্য অনুভূতির সঞ্চার পর্যন্ত ঘটেনি। আর সে জন্যই এত সব কষ্টের ভারে নুয়ে পড়ে মাযলূম জনতা যখন কষ্টের প্রহর গুণছে, বাবা হারানো শিশুটি যখন মাঝ রাতে ঘুমের ঘরে আব্বু আব্বু বলে চিৎকার দিচ্ছে, অগ্নিদগ্ধ মানুষগুলো যখন বার্ন ইউনিটের গভীর শান্ত রজনীকে চিৎকার দিয়ে অশান্ত করে তুলছে, হায়েনাদের বিষাক্ত ছোবলে সম্ভ্রম হারানো বোনটি যখন বাংলার কোন আদালতে বিচার না পেয়ে পাগল প্রায় হয়ে লিষ্ফল অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে, স্বামী হারানো বোনটি যখন কেঁদে চোখের জ্যোতি হারানোর উপক্রম, আর সন্তান হারানো হতভাগা বাবা-মা জীবনের শেষ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে যখন সন্তান হত্যার বিচারের সকল আশা ছেড়ে দিয়ে গভীর রজনীতে আল্লাহর যমীনে মাথা ঠুকে চোখের জলে জায়নামাজের পাটি শিতল করছে ঠিক এমনই সময়ে বাধভাঙ্গা আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে স্বপ্নিল আয়োজনে নেশায় বিভর হয়ে 'Thirty first Night'-এর গীত গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে বঙ্গীয় মুসলিম (?) জনতা। কতটা নাদান, নির্লজ্জ, বেহায়া হলে এই জাতি 'Thirty first Night'-এর মত বিজাতীয় সংস্কৃতির আষ্টেপৃষ্টে নিজেদের আবিষ্ট করে বেহায়াপনার চরম শিখরে পৌঁছতে পারে, তা হয়ত লৈখিক ছাপে ব্যক্ত করাটা অসম্ভব। তাই বলতে চাই, হে আত্মভোলা হতভাগা জাতি,

যেও না ভুলে নিজ পরিচয়
তুমি যে মুসলমান,
হারিয়ে ফেলেছ অতীত তোমার
যা কিছু ছিল সম্মান।
নেচ না তুমি পশ্চিমাদের
বাজনার সুর তালে,
সন্ধ্যা তোমার ঘনিয়ে এসেছে
ফিরে এসো আজ আপন গৃহে।
আঁকড়ে ধর কুরআন-সুন্নাহ
ঝেঁড়ে ফেল সব কুসংস্কার,
সব Night-ই Happy হবে
শুধু নয় ঐ Thirty First।

-আতাউর রহমান
এম.বি.এ.
হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কবিতা

আহলেহাদীছদের ভালবাসি

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
৮ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা

আমি সবুজ সুফলা দেশকে ভালবাসি
আমি আমার মাকে ভালবাসি
আমি বাংলাদেশকে ভালবাসি
তার চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসি।
আল্লাহকে ভালবেসে কুরআন হাদীছ পড়ি,
কুরআন হাদীছ পড়ে রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসি
কুরআন হাদীছকে ভালবেসে আল্লাহ্‌র পথে চলি।
আল্লাহকে ভালবেসে মনে পায় হিম্মত।
সত্যের পথের পথিক আমি
সকল বাধা বন্ধনকে করি আমি ছিন্ন।
আমি মানি না কোন কথা আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া
আমি ঈমানের শক্তি দিয়ে বলে উঠি
নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার।
মোরা অহি-র বিধান পাব কোথায়
আহলেহাদীছ ছাড়া।
আহলেহাদীছরা মানে না কোন বিধান
অহি-র বিধান ছাড়া
আমরা জান্নাতের আশায় সদায়
দাওয়াত ও জিহাদে আছি প্রস্তুত।
মোরা আহলেহাদীছ, আল্লাহকে ছাড়া কাউকে মানি না,
করি না কারো কুর্নিশ।
অহি-র বিধান মানতে মোরা সত্যের পথে চলি
জান্নাত পাওয়ার আশায় মোরা আহলেহাদীছ করি।
মোরা আহলেহাদীছ, মিথ্যাকে দেয় না কোন প্রশ্রয়।
মোরা আল্লাহকে ছাড়া কাউকে করি না ভয়।
বাংলার সকল যুবকেরা আহলেহাদীছে আয়,
তবেই তোরা ধরতে পারবি জান্নাতের পথ ভাই।
আল্লাহ তুমি আহলেহাদীছদের কবুল কর
ওগো দয়াময়।

-----o-----

শান্তির সন্ধানে

-আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
দশম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা

চারিদিকে একি দেখি আজ
শান্তির পথে কে ফেলেছে বাজ?
চারিদিকে কেন আজ অশান্তি প্রতিষ্ঠার সাজ
কিভাবে হয়েছে এমন দুঃসাহসী কাজ?
ইতিহাস করি অবলোকন
কিভাবে হয়েছিল শান্তির আগমন
শোন, কিভাবে হয়েছিল জুলুমের পতন
জাহেলী যুগ চলছিল তখন
দূর করার জন্য জাহেলিয়াতের আসন
গড়ে উঠল প্রথম কল্যাণকামী সংগঠন (হিলফুল ফুযূল)
মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা ও নীতিমালা পেল স্থান
দূর করা গেল না অশান্তির বান
প্রায় দু'যুগ পর নাযিল হল আল-কুরআন
অশান্তি দূরীকরণে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান
হ'ল শান্তির আগমন
ফিরে পেল মানবতা তাদের প্রাণ
শুরু হ'ল জাহেলিয়াতের অবসান!!
কিন্তু কেন আবার অশান্তি দখল করল সেই স্থান?
ইতিহাস কর পর্যবেক্ষণ
অশ্রুতে ভরে আসবে দু'নয়ন
আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিলেন যখন মুসলিম শাসকগণ
পুনরায় শুরু হল শান্তির পতন
নিজ চিন্তা প্রসূত বিধান পেল আসন
অশান্তি দখল করল শান্তির আসন
বহুবার মানবরচিত বিধান করা হয়েছে প্রয়োগ
বহুবছর হয়েছে বিয়োগ
কিন্তু শান্তি ব্যতীত সব কিছু হয়েছে যোগ
সুতরাং নয় কোন তন্ত্র-মন্ত্র
নয় আব্রাহাম লিংকনের গণতন্ত্র
নয় ধর্মনিরপেক্ষাতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র
বরং হে মুসলমান!
অনুসরণ কর আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধান
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের চূড়ান্ত বিধান
শান্তি দখল করবে অশান্তির আসন

------o------

হরতালের নিষ্ঠুরতা

-এস. এম. হাফীযুর রহমান
মানিকহার, সাতক্ষীরা

করছে যারা পিকেটারী
করছে যে ভাই বাড়াবাড়ি,
মরছে মানুষ, ভাঙ্গছে বাড়ি
দিচ্ছে আগুন পুড়ছে গাড়ি,
কাটছে গাছ, ভাঙ্গছে বাস
বাংলার এ মৃত্যুপুরিতে জীবন এখন পুঁটিমাছ
ইট-পাটকেল ছুড়া-ছুড়ি
রক্ষা পায় না বুড়া-বুড়ি
ঘাতকের ছোড়া ককটেল বোমায়
ছোট্ট শিশুটি জীবন হারায়,
রক্ত নিয়ে খেলছে হলি
নিরীহ মানুষ হচ্ছে বলি
প্রতিপক্ষের রগ কেটে ওরা
সবাই যেন আনন্দে মাতে।
সংঘাতে মরছে মানুষ ক্ষমতার তরে আজি
নেতা বলে, মারলে শহীদ, বাঁচলে গাজী
আমি বলি, ওরে পাজি
এভাবে আর কত করবে অশান্তির কারসাজি?
ক্ষমতার লোভ ছাড়ো
অহি-র বিধান ধরো,
হুকুমত নয়, তাওহীদ প্রতিষ্ঠায়
যদি জীবন চলে যায়
প্রকৃত শহীদ একেই বলি
সন্দেহ যে নাই।

-----o-----

সংগঠন সংবাদ

যেলা সংবাদ

কালাই উপযেলা, জয়পুরহাট ১৫ নভেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০.০০ টায় কালাই বাজার সংলগ্ন এন.সি.ডি.পি অফিসে কালাই উপযেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সরোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ' এর সহ-সভাপতি আব্দুন নূর, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মুহাম্মাদ মোনায়েম হোসেন। পরিশেষে মুস্তাক আহমাদ সারোয়ারকে সভাপতি এবং আবুল কাশেমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কালাই উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

দৌলতখালি, কুষ্টিয়া ১৭ নভেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর দৌলতখালি পূর্ব বাজারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক শাখা গঠন উপলক্ষে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা নযরুল ইসলামের অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফফার। পরিশেষে আশীকুর রহমানকে সভাপতি স্বপন এবং আহসান হাবীবকে সাধারণ সম্পাদক করে দৌলতখালি পূর্ব বাজারপাড়া শাখা গঠন করা হয়।

গড়বাড়িয়া, কুষ্টিয়া ৬ ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব গড়বাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শাখা সভাপতি আলহাজ্জ নাজমুল হক মুন্সির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল গাফফার, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ। পরিশেষে দেলোওয়ার হোসাইনকে সভাপতি এবং ইমাদুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত শাখা গঠন করা হয়।

সোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, ২৪ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাঁচবিবি উপযেলা কমিটি গঠন উপলক্ষে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত উনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলার প্রচার সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার। পরিশেষে আব্দুর রহমানকে সভাপতি এবং আব্দুন নূর (রকি)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পাঁচবিবি উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

সাইধারা, বাগমারা, রাজশাহী ২৪ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব সাইধারা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও লালইচ আলিম মাদরাসার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ (উত্তর)'-এর সহ-সভাপতি ও বাগমারা উপযেলার সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী কলেজের ইতিহাস বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র ওমর ফারুক।

সমসপুর, বাগমারা, রাজশাহী ২৫ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব সমসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন ও যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সভাপতি জনাব আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন (দক্ষিণ)'-এর সাধারণ সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যিল্লুর রহমান ও সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা হেলালুদ্দীন।

কমর গ্রাম, জয়পুরহাট, ১৭ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কমরগ্রাম পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ইসলামী জলসা উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলহাজ্জ রবীউল আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সেক্রেটারী অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মোতালেব আকন্দ প্রমুখ। পরিশেষে এন্তাজুল আকন্দকে সভাপতি এবং আব্দুল আউয়ালকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমরগ্রাম পূর্ব পাড়া শাখা গঠন করা হয়।

মচমঈল, বাগমারা, রাজশাহী ১১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর সৈয়দপুর-মচমঈল মহিলা কলেজ মাঠে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মচমঈল এলাকার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন (দক্ষিণ)'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ' সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ (উত্তর)'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম আহমাদ ও বাগমারা উপযেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যিল্লুর রহমান। সম্মেলনে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও দ্বিতীয় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ শরীফুল ইসলাম মাদানী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন প্রমুখ। ইসলামী জাগরণী পেশ করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের ছাত্র আব্দুল হাসীব।

ছাত্র সমাবেশ

কোরপাই, কুমিল্লা ২৫ জানুয়ারী শনিবার : অদ্য সকাল ১১ টায় কোরপাই কাকিয়ারচর ইসলামিয়া সিনিয়ার ফাযিল মাদরাসায় এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারাণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয়

সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইবরাহীম সহ কোরপাই এলাকা এবং কোরপাই মাদরাসা শাখার ছাত্র ও কর্মীবৃন্দ।

গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর গাইবান্ধা সদরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন পলাশবাড়ী উপযেলা সভাপতি আশীকুর রহমান, গাইবান্ধা পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী, গাইবান্ধা সদর উপযেলার আহ্বায়ক ও ইসলামী ব্যাংক গাইবান্ধা শাখার কর্মকর্তা মুস্তাফীযুর রহমান, মুহাম্মাদ রনী ও মুস্তাকসহ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, গাইবান্ধা সদর উপযেলা অনুষ্ঠিত হওয়া এটিই প্রথম প্রোগ্রাম।

মৃত্যু সংবাদ

গত ২৫ জানুয়ারী রাত ৮.৩০ মিনিটে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জয়পুরহাটে যেলার সাবেক সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আবু হাসান (২৬)-কে জবাই করে তাঁর মটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন)।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, সদর থানার অন্তর্গত পালিকাদোয়া গ্রামের মোঃ আবু হাসান, পিতা মৃত হাফিযুর রহমানকে ঐ গ্রামের অদূরে ঈদগাহ মাঠের পার্শ্বে আলুর জমিতে রাত প্রায় সাড়ে আটটায় হত্যা করে। গাড়িতে জ্বালানী ওঠানোর জন্য সন্ধ্যার পর জয়পুরহাট শহরে তেলের পাম্পে যায় এবং কিছুক্ষণ পরই তেল উঠিয়ে বাসার দিকে বাড়ী আসার পথে আটকিয়ে জবাই করে এবং সঙ্গে থাকা ব্যবহৃত মটর সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। সে চৌমুহনী বাজারে হার্ডওয়ারের ব্যবসা করত। কী কারণে কারা হত্যা করতে পারে তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে গাড়ী ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই হত্যা করতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে। রাতেই পুলিশ এসে তার লাশ নিয়ে যায়।

পরের দিন পারিবারিক কবরস্থানে বিকাল ৪.০০ ঘটিকার সময় স্থানীয় বানিয়াপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবু তালেবের ইমামতিতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন যেলা আন্দোলনের সভাপতি আলহাজ্জ মাহফূযুর রহমান, আলহেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম, যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক মুহাম্মদ আমীনুল ইসলাম, বর্তমান সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালাম, বানিয়াপাড়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান, ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম রাব্বানী ও যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মীরাসহ এলাকার বিপুল সংখ্যক জনসাধারণ।

মৃত্যুকালে সে স্ত্রী, ১ বছরের ছেলে, মা ও ১ বোন রেখে যান। আমরা দো'আ করি আল্লাহ তাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রবাসী সংবাদ

মালদ্বীপ : গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মালদ্বীপ গমন করেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন মালদ্বীপ' শাখার উদ্যোগে মালদ্বীপ রাজধানীর মালে 'শিহাবুদ্দীন স্কুল' মিলনায়তনে আয়োজিত ২ ও ৩ জানুয়ারী দুই দিনব্যাপী এক ইসলামিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মালদ্বীপ শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পীস টিভি বাংলার আলোচক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান অতিথি ১ম দিন 'বিশুদ্ধ আক্বীদা'র উপর ভাষণ দান করেন। দ্বিতীয় দিন তিনি ভাষণ দান করে 'জাল ও যঈফ হাদীছের কুপ্রভাব' বিষয়ে। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, 'হুলহুমালে' দ্বীপের শাখা মসজিদের ইমাম ফায়যুল্লাহ, শাখার উপদেষ্টা হাফেয শফীক, বেলালুদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কামরুল ইসলাম বিপ্লব। তত্ত্বধানে ছিলেন সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হাশেম, নূরুল আমীন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন উপদেষ্টা ফায়ছাল আহমাদ, যুয়েল, আফযাল প্রমুখ।

উক্ত সম্মেলন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভাপতি আরো কয়েকটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ১লা জানুয়ারী হুলহুমালে দ্বীপের কেন্দ্রীয় মসজিদে আছর ছালাত আদায় করেন এবং পার্শ্ববর্তী এক শাখা মসজিদে বাদ মাগরিব সুধী সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন। ৩রা জানুয়ারী রোজ শুক্রবার সাংগঠনিক ভাইয়েরা তাকে পার্শ্ববর্তী দ্বীপ দেখানোর জন্য হিলিগুলিতে নিয়ে যান। অতঃপর বাদ জুম'আ হুলহুমালে এক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্য 'শিরক ও বিদ'আতমুক্ত আমল' শিরোনামে বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর বাদ আছর মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় মসজিদে কর্মী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি সংগঠন শিক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ৪ঠা জানুয়ারী শনিবার সুনামী টাওয়ারের পার্শ্বে কর্মীদের সামনে বিদায়ী ভাষণ দেন। অতঃপর স্থানীয় সময় রাত ১০টায় কর্মীদের নিকট থেকে বিদায় নেন। বিদায়ের সময় বিমান বন্দরে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিদায়ের বেদনায় তারা সকলে কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অতঃপর মালদ্বীপ থেকে শ্রীলংকা হয়ে ৫ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখ দুপুর ১২টায় ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, বিদেশের মাটিতে সাংগঠনিক ভাইয়েরা অতি সুন্দর, সুনিপন প্রোগ্রাম করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। তারা নিজেদের কার্যক্রম বন্ধ করে রাতদিন যেভাবে প্ররিশ্রম করেছেন তা কোনদিন ভুলার মত নয়।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

(মসজিদুল হারাম : পর্ব-৩)

১. হাজীরা কা'বার কোন্ রুকন থেকে ত্বাওয়াফ শুরু করেন?
উত্তর : রুকনে শারক্বী বা রুকনে আসওয়াদ তথা পূর্বকোণ থেকে।
২. কা'বার উত্তর কোণকে কী বলা হয় এবং কেন?
উত্তর : রুকনে শিমালী বা রুকনে ইরাক্বী; ইরাক্বমুখী হওয়ার কারণে।
৩. কা'বার পশ্চিম কোণকে কী বলা হয় এবং কেন?
উত্তর : রুকনে গারবী বা রুকনে শামী; সিরিয়ামুখী হওয়ার কারণে।
৪. কা'বার দক্বিণ কোণকে কী বলা হয় এবং কেন?
উত্তর : রুকনে জুনুবী বা রুকনে ইয়ামানী; ইয়ামানমুখী হওয়ার কারণে।
৫. কা'বাকে বছরে মোট কতবার এবং কখন ধৌত করা হয়?
উত্তর : কা'বাকে প্রতিবছর মোট দুইবার ধৌত করা হয়; রামাযান মাসে ও হজ্জের মাসখানেক পূর্বে।
৬. কা'বা কাদের উপস্থিতিতে ধৌত করা হয়?
উত্তর : সঊদী বাদশাহসহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের।
৭. কা'বার দরজার চাবি কাদের কাছে সংরক্ষিত থাকে?
উত্তর : বনু শায়বা বংশের উত্তরাধিকারীদের কাছে।
৮. হাজারে আসওয়াদ কী?
উত্তর : একটি জান্নাতী পাথর *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১৮)*।
৯. হাজারে আসওয়াদ কা'বা শরীফের কোন্ প্রান্তে অবস্থিত?
উত্তর : কা'বার দক্বিণ-পূর্ব প্রান্তে।
১০. হাজারে আসওয়াদ পাথরটি কে, কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ); আল্লাহ্র পক্ষ থেকে।
১১. হাজারে আসওয়াদ পাথরটি প্রথম কে কা'বা ঘরের কোণে স্থাপন করেন?
উত্তর : ইবরাহীম (আঃ)।
১২. হাজারে আসওয়াদ পাথরটি কেমন ছিল?
উত্তর : বরফের চেয়ে বেশী সাদা *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১৮)*।
১৩. হাজারে আসওয়াদ পাথরটি এখন দেখতে কেমন এবং কেন?
উত্তর : কালো; আদম সন্তানের পাপ শুষে নেওয়ার কারণে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১৮)*।
১৪. হাজারে আসওয়াদের নূরের প্রকৃতি কেমন?
উত্তর : পূর্ব-পশ্চিমব্যাপী সর্বত্র আলোকময় করার ন্যায় *(মিশকাত হা/২৫৭৯)*।
১৫. হাজারে আসওয়াদটির প্রথম আকৃতি কেমন ছিল?
উত্তর : আস্ত একটি টুকরা।
১৬. পাথরটি কারা, কত সালে উঠিয়ে নিয়ে যায়?
উত্তর : কারামতিয়া শী'আ সম্প্রদায়; ৯৫০ খৃষ্টাব্দে।
১৭. উক্ত পাথরটি কত বছর পরে, কত সালে ফিরিয়ে আনা হয়?
উত্তর : ২০ বছর পর; ৯৭০ খৃষ্টাব্দে।
১৮. পাথরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর তা টুকরাগুলোকে কোথায় এবং কিসের মাধ্যে রাখা হয়েছে?
উত্তর : প্রায় ১ ফুট ব্যাসার্ধের পাথরের মধ্যে; রৌপ্যের ফ্রেমে।
১৯. রৌপ্যের ফ্রেম লাগানোর কাজের প্রথম সূচনা করেন কে?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)।
২০. 'হাতীম' কাকে বলে?
উত্তর : কা'বার উত্তর-পশ্চিমাংশে দেড় মিটার উচ্চতার অর্ধবৃত্তাকারে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অংশটিকে 'হাতীম' বলা হয়।
২১. অর্ধবৃত্তাকারে ঘেরা প্রাচীরটিকে কী বলা হয়?
উত্তর : হিজরে ইসমাঈল।
২২. কা'বার দরজাটি কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : কা'বার উত্তর-পূর্ব দেয়ালে।
২৩. কা'বার দরজাটি ভূমি থেকে কত ফুট উচ্চতায় অবস্থিত?
উত্তর : প্রায় ৭ ফুট (২.১৩ মিটার) উচ্চতায়।
২৪. কা'বার দরজার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত মিটার?
উত্তর : দৈর্ঘ্য ৩.১০ মিটার এবং প্রস্থ ১.৯০ মিটার।
২৫. কা'বার দরজা প্রথমে কিসের তৈরী ছিল?
উত্তর : লোহার।
২৬. লৌহনির্মিত এই দরজায় সর্বপ্রথম স্বর্ণের প্রলেপ স্থাপন করেন কে?
উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব।
২৭. কত সালে উক্ত দরজা দু'টিতে খাঁটি স্বর্ণের পাত লাগানো হয়?
উত্তর : ১৯৭৯ সালে।
২৮. কোন্ বাদশাহ্র নির্দেশে উক্ত কাজ করা হয়?
উত্তর : বাদশাহ খালেদ বিন আব্দুল আযীয।
২৯. দরজা দু'টিতে স্বর্ণের পাত লাগাতে মোট কত ব্যয় হয়?
উত্তর : মোট ১ কোটি ৩৪ লাখ ২০ হাযার সঊদী রিয়াল।
৩০. উক্ত দরজা দু'টিতে কত কেজি স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে?
উত্তর : ২৮০ কেজি।
৩১. মূল পাল্লার উপর সুন্দর ও অনুপম কারুকার্য সম্পন্ন করতে কতদিন সময় লাগে?
উত্তর : দীর্ঘ এক বছর।
৩২. দরজার উপর কী উৎকীর্ণ রয়েছে?
উত্তর : পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত ও আল্লাহ্র ১৫টি গুণবাচক নাম।
৩৩. দরজায় লাগানো তালাটি কত সালে নির্মিত হয়েছে?
উত্তর : ১৯৬৯ সালে।
৩৪. কা'বার দরজার তালা দেখতে কিসের মত?
উত্তর : তুর্কী সুলতান আব্দুল হামীদের তৈরী পুরাতন তালার মত।
৩৫. কা'বার উপর গেলাফ চড়ানো কবে থেকে চলে আসছে?
উত্তর : প্রাচীনকাল থেকে।
৩৬. কা'বার গেলাফ সর্বপ্রথম কার মাধ্যমে সূচনা হয়?
উত্তর : ইসমাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে।
৩৭. কারো কারো মতে, কা'বার গেলাফ সর্বপ্রথম কার দ্বারা সূচনা হয়?
উত্তর : ইয়ামানের বাদশাহ আস'আদ হিমইয়ারী তব্বার মাধ্যমে।
৩৮. কা'বার গেলাফ চড়ানোর ব্যাপারে কোন যুগে কি ব্যত্যয় ঘটেছে?
উত্তর : না।
৩৯. কত সালে ও কার নির্দেশে কা'বার গেলাফ তৈরীর জন্য পৃথক একটি কারখানা নির্মাণ করা হয়?
উত্তর : ১৯৭২ সালে; বাদশাহ ফাহ্দ-এর।
৪০. কা'বার গেলাফ তৈরীর কারখানা কত সালে নির্মাণ শেষ হয়?
উত্তর : ১৯৭৭ সালে।
৪১. উক্ত কারখানায় কত জন কর্মচারী কর্মরত ছিলেন?
উত্তর : ২৪০ জন।
৪২. কা'বার গেলাফ কতদিন পর পরিবর্তন করা হয়?
উত্তর : বছরে একবার।
৪৩. কা'বার গেলাফটি কী রঙের?
উত্তর : গাঢ়ো কালো রঙের।
৪৪. উক্ত গেলাফটি কত খণ্ড বিশিষ্ট?
উত্তর : ৫ খণ্ড।
৪৫. কা'বার গেলাফ কিসের তৈরি?
উত্তর : উন্নতমানের রেশম ও স্বর্ণ দ্বারা।

আইকিউ

[কুইজ-১; বর্ণের খেলা-২; শব্দজট-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২০ মার্চের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৫ :

১. 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থের লেখক কে?
২. 'তাযকিরাতুল মাওযু'আত' গ্রন্থের লেখক কে?
৩. শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) কোন্ মাদরাসার ছাত্র ছিলেন?
৪. মাওলানা বেলায়েত আলী (রহঃ) কী নামে বিখ্যাত ছিলেন?
৫. মুছ'আব বিন উমায়ের (রাঃ)-এর চেহারা কার সাথে মিল ছিল?
৬. 'জমঈয়তে উলামায়ে হিন্দ' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
৭. কত সালে কা'বা শরীফ আক্রমণের শিকার হয় এবং কার মাধ্যমে?
৮. ভারতের সংবিধানে মোট কয়টি ধারা রয়েছে?
৯. ভারতের সংবিধান মোট কয়বার সংশোধিত হয়েছে?
১০. মুযাফফরনগর ভারতের কোন প্রদেশের যেলা?
১১. 'অফিস' শব্দের বাংলা অর্থ কী?
১২. 'সিএনজি'-কে পাকিস্তানী ভাষায় কী বলা হয়?
১৩. 'ভাত'-কে চাউল বলা হয় কোন্ দেশে?
১৪. 'নামাল কলেজ' কে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোন দেশে?
১৫. 'ইযখির' কী?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী ও ২৬ ছফর ১৩৯৮ হিজরী ২. ১৯৮৯ সালের জুন মাসে ৩. তাওহীদ ৪. ১৯৮৫ সালে ৫. ঈদ সংখ্যা ৬. হাজারে আসওয়াদ ও কা'বা ঘরের মাঝের অংশ, যেখানে কিছুক্ষণ বুক ও গাল লাগিয়ে থাকতে হয় ৭. ৩০ কিলোমিটার ৮. ৩/৪ কিলোমিটার ৯. মাছের কলিজা ১০. ১৪০ কোটি টাকা ১১. কুষ্ঠ রোগে ১২. আত্মহত্যা করে ১৩. ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ ১৪. তিন ভাগে ১৫. ২০০৮ সালের ২৮ আগস্ট।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. আয়েশা খাতুন (কুষ্টিয়া) ২. মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা) ৩. আসাদুল্লাহ আল-গালিব (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

বর্ণের খেলা ২/৫ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সর্ববৃহৎ আয়োজনের নাম জানা যাবে।

১.......................
২.......................
৩.......................
৪.......................

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.........

গত সংখ্যার বর্ণের খেলার উত্তর : (১) তাকবীর (২) তাওরাত (৩) তামহীছ (৪) তাদরীব; **অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম : তাওহীদ।**

গত সংখ্যার বিজয়ীদের নাম : ১. শরীফুল ইসলাম (ভাটপাড়া, সাতক্ষীরা) ২. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী) ৩. ছিফাত আহমাদ আলিফ (সাতক্ষীরা)।

শব্দজট ৩/৫:

এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ও কাকিলাদহ, কুষ্টিয়া।]

■	■	■	১	■	■	■
■	■	২		৩	■	■
■	৪		■	৫	৬	■
৭		■	■	■	৮	
■	৯	১০	■	১১		■
■	■	১২	১৩		■	■
■	■	■		■	■	■

পাশাপাশি : ২. বিশ্বের উচ্চতম প্রাণী ৪. যে উদ্ভিদের ফুল ও ফল হয় না, কেবল পাতাই ব্যবহার করা হয় ৫. `Creeper' শব্দের অর্থ ৭. গম জাতীয় শষ্য ৮. কুমড়া জাতীয় সবজি ৯. ক্বিয়ামতের দিন মুক্তি প্রাপ্ত ফের্কা ১১. ঠোঁটদ্বয়ের উপরের অঙ্গ ১২. ইসলামের প্রথম যুদ্ধ

উপর-নীচ : ১. শশা জাতীয় শষ্য ২. আগুনের তৈরী জীব বিশেষ ৩. `Fruit' শব্দের অর্থ ৪. বাংলাদেশের যে যেলায় একমাত্র মানসিক হাসপাতাল অবস্থিত ৬. মুসলমান রীতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ১০. জীবন আছে যার, প্রাণী বা উদ্ভিদ ১১. জাহান্নামের আগুন ১৩. দুধ দিয়ে তৈরী খাবার বিশেষ

গত সংখ্যার শব্দজটের উত্তর : পাশাপাশি : ১. হাত ২. ঢাকা ৪. কাজী ৬. কান ৮. হাদীছ ১০. লাশ ১১. হীরা ১৪. নাক ১৬. চাল ১৭. লাল ১৮. কবি। **উপর-নীচ :** ১. হাজী ৩. কাকা ৪. কাজ ৫. নদী ৭. নবী ৮. হাশর ৯. ছহীহ ১২. সোনা ১৩. দুল ১৫. কলা ১৬. চাবি।

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. মামূনুর রশীদ (কুষ্টিয়া) ২. আয়েশা খাতুন (কুষ্টিয়া) ৩. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৫:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

গত সংখ্যার সংখ্যা প্রতিযোগের উত্তর : (১) ৫×২−৩+১=৮ (২) ৮÷৪ ৬−৭=৫ (৩) ৭×২−৯+৪=৯

গত সংখ্যায় বিজয়ীদের নাম : ১. আয়েশা খাতুন (কুষ্টিয়া) ২. মামূনুর রশীদ (কুষ্টিয়া) ৩. আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী)।

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা :** বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*